

যোগীরাজ
ব্রহ্মচারী
কুলদানন্দ

গঙ্গানন্দ

যোগীরাজ

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬১

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ

৬॰ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দাম ঃ দুই টাকা পঁচিশ নঃ পঃ

শ্রীসুদর্শন-সম্পাদক শিশির কুমার ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক কলিকাতা-৩ অন্নদা নিয়োগী লেন হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ২, দুর্গাচরণ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ আনন্দময়ী আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

হে গুরো!

... কি অপূর্ব্বই না তোমার জীবন-উদ্যান!

সে উদ্যানের কত না বিটপি লতায় বিচিত্র কুসুমরাজী

... প্রস্ফুটিত হইয়া

... দিকে দিকে সৌরভ বিতরণ করিতেছে।

অপূর্ব্ব সুগন্ধ সে সকল কুসুমরাজীর যে কয়টি

... চয়ন করিয়া

... এই গ্রন্থরূপ মাল্য রচনা করিয়াছি

তাহাই আজ আমার জন্মদিনে প্রণামস্বরূপ

... তোমাকে অর্পণ করিলাম।

... এই প্রণাম—এই পূজারূপ-প্রণাম

... গঙ্গানারায়ণের

... গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা

... ছাড়া

... আর কিছুই নহে।

...

...

১৮ই মাঘ, ১৩৬১ বাংলা
৬০ নং সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬।

তোমারই
গঙ্গানারায়ণ

সূচী পত্র

——:০:——

ভূমিকা

শ্রীমৎ গঙ্গানন্দজী আমাদের আচার্য্য এবং উপদেষ্টা। তাঁহার লিখিত "যোগীরাজ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ" পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে আদিষ্ট হইয়া আমার প্রতি তাঁহার পরম অনুগ্রহেরই পরিচয় পাইয়াছি। জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পেঁাছিয়াছি। চারিদিকে অন্ধকার। কৃপাই এখন একমাত্র সম্বল। এজন্য তাঁহাকে অশেষ প্রণতি নিবেদন করিতেছি। সুদূর শৈশবের কথা আজ মনে পড়ে। জীবন্ত সেই অনুভূতি ; গোসাঁইজীর শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া শিব মনে করিয়া সেদিন প্রণাম করিয়াছিলাম। পরে গুরু কৃপায় বুঝিতে পারি, ভুল হয় নাই ; এমনই চিন্ময় উদয়। সদাশিব শঙ্করের আর এক মূর্ত্তি দেখিলাম প্রথম যৌবনে। ইনি নীলকণ্ঠ। সে কথাও বহু দিনের। রাজনীতির উন্মাদনাময় আবর্ত্তে পড়িয়া তখন ঘুরিতেছি। কি জানি কেন, কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্নবিক্রেতা ৺পুটিরাম মোদক মহাশয়ের দোকানে উঠিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে একটু বিশ্রাম। বসিয়া আছি, কে একজন চৌকির উপর হইতে একখানি গ্রন্থ লইয়া আমার হাতে দিলেন। 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থখানির নাম। পাতা খুলিতেই জটাজুটশোভিত রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত একটি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার চোখে পড়িল ; আলোকের স্পর্শ পাইল হৃদয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে কে যেন ভিতরের বাতি জালিয়া দিল। গ্রন্থখানির কতকাংশ তখন পড়িয়াছিলাম, পরে আরও পড়িয়াছি। পড়িয়া কিছুই বুঝি নাই। সে সামর্থ্যই বা আমার কোথায় ? বিশেষতঃ আমার মন এমনই জড় যে,

পড়ার ভিতর দিয়া এই মন বিশেষ কিছু ধরিতে পারে না। বোলের মাঝে কোল না পাইলে কেবল গোলই বাড়ে। প্রেমের রূপ যদি কিছু এই মন পায় তবেই কোনও রকমে সাড়া দেয়। রূপেই ডোবে। ফলতঃ শুধু বিধি বিধান বা উপদেশে আমার এই চঞ্চল মন বসে না। 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ' গ্রন্থখানিতে যাহা কিছু পড়িয়াছি সবই ভুলিয়াছি, কিন্তু ঐ ছবিখানি এখনও ভুলিতে পারি নাই। আমার সকল পড়া সেইখানেই বোধ হয় হারাইয়া যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীগঙ্গানন্দজীর মহিমা জয়যুক্ত হউক। তিনি আমার বিলুপ্ত স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করিলেন। আমার আঁধার জীবনে তিনি কৃপার আলোক সম্পাত করিলেন। জটাজুটবিমণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় সেই নীলকণ্ঠ মূর্ত্তি আমার আঁধার চিত্ত আলোকিত করিয়া আবার জাগিল। শ্রীশ্রীকুলদানন্দ মহারাজের সর্ব্বভূতে সেই আত্মদর্শন, বিশ্ব পরিব্যাপ্ত উজ্জ্বল প্রেমের সেই পরম মহিমা, পতিত এবং তাপিতের প্রতি অমোঘ এবং অপ্রাকৃত অনুকম্পার সেই রীতি, ভীতিময় আমার এই জীবনে একান্ত আশ্বস্তি উদ্দীপ্ত করিল; প্রাণের তারে ঝঙ্কৃত হইল মধুময় প্রশান্তির গীতি।

বুঝিলাম কৃপা তবে আছে—আমার মত যে অভাজন তাহার জন্যও কৃপার ভাণ্ড উন্মুক্ত রহিয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপা বুঝিবার শক্তি নাই। সে কৃপা-সাগরে সব সময়েই ত ডুবিয়া আছি, তবু অহঙ্কার, তবু বিকার। মহাপুরুষ-সংশ্রয়ই ভগবৎকৃপা লাভের একমাত্র উপায়, শাস্ত্রে এই কথা শুনিয়াছি। শ্রীভাগবত বলেন, অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন পশুপ্রায় যাহারা, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সিদ্ধরূপে ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীসনক, সনন্দ, সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, ব্যাস, বশিষ্ঠ, মার্কণ্ডেয়, জাতুকর্ণ, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম এই সিদ্ধেশবর্গ ভগবৎকৃপার অমৃত পাত্র হাতে লইয়া পথে পথে ঘুরিতেছেন। তাঁহারা

কেহই আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। বস্তুতঃ এই জগৎযন্ত্র তাঁহাদেরই কৃপাসূত্রে পরিচালিত হইতেছে। লোকানুগ্রহের বিগ্রহস্বরূপ তাঁহারা। শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ভগবৎকৃপার এমনই উজ্জ্বল বিগ্রহ মূর্ত্তি। শ্রীভগবান্ যেমন নিত্য তাঁহার বিগ্রহমূর্ত্তি এই সব লোকানুগ্রহ-পরায়ণ সিদ্ধগণ তেমনই নিত্য। তাঁহাদিগের লীলাও নিত্য। শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ মহারাজের অবদানে এই পরম সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইল। মহাপুরুষ সংশ্রয়ের ধারাটি তিনি আমাদিগকে ধরাইয়া দিলেন। অসহায় জাতিকে তিনি পরম সম্বলের সন্ধান দিলেন। সদ্গুরুর প্রত্যক্ষ কৃপা-প্রাপ্ত পুরুষ তিনি। মহাপুরুষ-সংশ্রয়ে পরম প্রতিষ্ঠা লাভের ভাবটি এমন সরস করিয়া ব্যক্ত করিবার অধিকার শুধু তাঁহারই আছে। "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে, গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখায় আপনে।" নতুবা অতি গূঢ় গুরুতত্ত্ব ব্যক্ত করিবে কে? কৃপা অন্তরে পরিস্ফুর্ত্ত না হইলে মহাপুরুষগণের অপ্রাকৃত লীলার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাও সম্ভব হইতে পারে না। সাহিত্যিকের রচনার রীতির চাতুর্য্য এবং ঐতিহাসিকের তথ্য বিন্যাসের পারিপাট্য—এ ক্ষেত্রে একান্তভাবেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগঙ্গানন্দজী সাধক, প্রত্যক্ষানুভূতির রস তাঁহার রচনাকে মধুর এবং উজ্জ্বল করিয়াছে। বুদ্ধির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার অবদান আত্মসংস্পর্শের অনাময় রাজ্যে আমাদের চিত্তকে উন্নীত করে।

তাঁহার এই অবদান আমাদের অজ্ঞানতা দূর করিতে সাহায্য করুক। শাস্ত্রবাক্য এবং ঋষিবাক্যে আমাদের শ্রদ্ধা বলিষ্ঠ করিয়া তুলুক। নানা মতবাদের প্রভাবে বর্ত্তমানে চিত্ত আমাদের বিক্ষিপ্ত, আমরা জীবনে নিত্য পদার্থ উপলব্ধির পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। এ পথ বাঁচিবার পথ নয়। সকল রকম উদ্বেগ এবং অশান্তিকর অবস্থার মধ্যে আমরা পতিত। আজ আমরা মানসিক ব্যাধিতে বিকারগ্রস্ত এবং

বিপর্য্যস্ত। এ দুর্গতি হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? বাঁচিবার পথ কোথায়? দ্বারকাবাসীগণ, শ্রীভগবানের চরণে প্রণত হইয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন আজ সেই প্রার্থনাই প্রাণে জাগিতেছে। গঙ্গানন্দজীর বচনে ভাগবতের সেই কীর্ত্তনের সুরটিই কানে বাজিতেছে। "এসো প্রভু, আবার এসো, বিশ্বভাবন তুমি, দুঃখকষ্টে পীড়িত আমরা, আমাদের কাছে ধরা দাও, ঠাকুর! তুমি আমাদের মাতা, সুহৃদ্, পতি, তুমিই আমাদের পিতা।" ইহা সবই সত্য; কিন্তু সত্য হইলেও অব্যক্ত। তুমি একবার সদ্‌গুরুস্বরূপে সকল কালো আলো করা রূপে দেখা দাও। যদি আমরা তোমার অনুবৃত্তি লাভ করিতে পারি তবেই কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইব।

ইতি

৭|৩|। কৃপাপ্রার্থী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন:

ব্রহ্মচারিজীর জীবনবেদ

যুগের ধর্ম্ম নাস্তিকতা তাই আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক জীবন-কথা অবিশ্বাস্য। এমনি সঙ্কটময় যুগে যে আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিকের দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আয়ত্তাধীন নহে তাহা বলিতে গেলে যুগধর্ম্মের কঠোর ও কঠিন পাদপীঠে মাথা ঠুকিয়াই বলিতে হয়। ফলে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইবে জানি—রক্তমোক্ষণও অবশ্যম্ভাবী তথাপি না বলিয়া উপায় নাই—বলিতেই হইবে। বলিতে হইবে এইজন্য যে জাতির আজ চরম দুর্দ্দিন। সে দুর্দ্দিনের কারণ কি তাহাই দেখা যাউক।

একরস তিনি বহু হইলেন। এই বহুত্বই সৃষ্টি। সৃষ্টির বৈচিত্র্য তাই অনস্বীকার্য্য। এই বিচিত্রতায় এক এক জাতির বৈশিষ্ট্য এক এক রূপ। যে জাতির যাহা বৈশিষ্ট্য তাহাই সেই জাতির স্বধর্ম্ম তথা প্রাণশক্তি। ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা। তাই ভারতীয় জাতির স্বধর্ম্ম এবং প্রাণশক্তিও এই আধ্যাত্মিকতাই। স্বধর্ম্ম বিচ্যুতি আর প্রাণশক্তিবিহীন হওয়া একই কথা। স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণের ফল যে ভয়াবহ সে কথা ভগবান্ স্বয়ংই আমাদের স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বজ্র নির্ঘোষ স্বরে বলিয়াছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এই পরধর্ম্ম গ্রহণ আমরা করিয়াছিলাম দুই কারণে। এক পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছিল পরধর্ম্মগ্রহণে। বিজিত জাতি বিজেতার সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মবিচ্যুত হয় ইহাই চিরন্তন নিয়ম। তাই রাষ্ট্রীয় অধীনতা জাতির

প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে শুষিয়া লয়। দ্বিতীয় কারণ হইল, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের নিত্যনূতন বিস্ময়কর আবিষ্কার আমাদিগকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে আমরা সত্যদৃষ্টি হারাইয়া পাশ্চাত্ত্যের ভোগবাদ তথা নাস্তিক্য-বাদকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইলাম। কাজেই স্বধর্ম্মের বিচ্যুতিতে আমরা যে পথ ধরিয়া যাত্রা সুরু করিলাম সে পথ পর-ধর্ম্মের ভয়াবহ পথ। সে পথ মৃত্যুপথ—অমৃতপথের বিপরীত তাহার গতি। তাই বলিতেছিলাম, মরণ-পথের অভিযাত্রী জাতিকে আজ জীবনপথের সন্ধান দিতে হইলে আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক জীবনকথাই তাহার সম্মুখে পথ-নির্দ্দেশক আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় তুলিয়া ধরিতে হইবে।

পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল আজ খসিয়া পড়িয়াছে। শৃঙ্খলমুক্ত জাতির আজ নব জন্ম। নবজাত শিশুর দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্য আধ্যাত্মিকতার বীজমন্ত্রই তাহার কর্ণে প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় জাতক অচিরেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে। কিন্তু এখানেও অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রতিকূল মনোবৃত্তি। তাঁহারা মনে করেন এই আধ্যাত্মিকতাই ভারতকে ইহকালবিমুখ করিয়া রিক্ত ও নিঃস্ব করিয়াছে। তাহার দীন বেশ, হীন অবস্থা ও বুভুক্ষার হাহাকার সব কিছুরই মূলে রহিয়াছে আধ্যাত্মিকতার ত্যাগমন্ত্রৌষধির বিষক্রিয়া। না, একথা সত্য নহে। আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্ম আমাদিগকে ইহকালবিমুখ হইতে শিক্ষা দেয় নাই। ভারত যে দিন আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে—ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিত সে দিন তাহার ইহকালের ভোগৈশ্বর্য্যও জগৎবাসীর বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারিত না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা যে ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের সংজ্ঞা কি তাহা আমরা জানি না অথবা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভীতি উৎপাদক এই ভ্রান্ত ধারণা। ঋষিকথিত ধর্ম্মের সংজ্ঞা—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধৰ্ম্মঃ"—যদ্দারা অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহকালে বৈধ বৈভব এবং দেহান্তে স্বর্গাদিসুখ লাভ হয় এবং যদ্দারা নিশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ধৰ্ম্ম। তবেই দেখিতে পাওয়া যায় ধৰ্ম্ম শুধু ইহকাল কিংবা শুধু পরকালকেই জীবনের আশ্রয় বলে নাই। ইহ ও পরকাল লইয়াই জীবন—জীবনের পূর্ণতা। ইহাই তাহাদের বক্তব্য—ঋষিদৃষ্টি পূর্ণ দৃষ্টি—সামগ্রিক দৃষ্টি। তাই ঋষিকথিত শাস্ত্রে আমরা পূর্ণ জীবনের কথাই দেখিতে পাই। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস—নিখিল শাস্ত্র আৰ্য্যজাতির জীবনকে যে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করিয়াছেন তাহাতে যেমন আছে সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা তেমন আছে গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা। গার্হস্থ্য আশ্রমে অর্থ বিত্তাদি আহরণের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন। দারিদ্র্য এবং ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা তাঁহারা শতমুখে করিয়াছেন। "অন্নং বহু কুর্বীত" ঋষি-কণ্ঠে উচ্চারিত এ বাণী বেদেরই বাণী। তবে সে আহরণ বৈধ উপায়ে এবং ভোগও বৈধ ভোগ হওয়া চাই। কবির ভাষায়—"ভোগেরে বেধেছ তুমি সংযমের সাথে" তাহা যদি না হয়, আহরণ যদি বঞ্চনার পথ ধরিয়া চলে তবে বঞ্চনাকারী ও বঞ্চিতের মধ্যে সংঘাত অপরিহার্য্য—বিদ্রোহের দাবানল সেখানে জ্বলিয়াই উঠিবে। তাই জগতের উন্নতিশীল জাতিগুলির দিকে তাকাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যদিও তাহাদের ঐশ্বর্য্যের স্তূপ আকাশস্পর্শী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তথাপি বঞ্চনাকারীর এই আকাশস্পর্শী স্তূপ যে বঞ্চিত ব্যক্তিগণের বিদ্রোহের ভূমিকম্পে কখন ধূলিস্যাৎ হইয়া যাইবে এই ভয়ে তাহারা সদাই সশঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত। বঞ্চনার পথে আহরণের পরিণাম ইহাই। তাই ন্যায় পথে আহরণ এবং বৈধ ভোগের ব্যবস্থা ঋষিগণ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে কথা না শুনিয়া ভোগের পথে—অবৈধ ভোগের পথে চলিয়াই জগতের প্রত্যেকটি জাতি আজ শান্তি হারা—সোয়াস্তি-হারা। ঋজু পথে না চলিয়া কুটিল পথে চলিয়া কেহ কাহাকেও বিশ্বাস

করিতে পারিতেছে না ;—ভয়ে একে অন্যের বুকে মৃত্যুবাণ হানিবার জন্য কি ভয়ঙ্কর প্রস্তুতিই না চলিতেছে। যাহার ফলে এ্যাটম আর হাইড্রোজেন বমের আবিষ্কারে মানব-জাতিকে আজ মরণ-ভয়ে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ—তাহার ভাগ্যদেবতা কি তাহাকে নিয়া এমন কঠোর পরিহাসই করিতেছেন, যাহার কোন প্রতিবিধানই নাই? না, তাহা হইতে পারে না। প্রতিবিধান আছে। সেই প্রতিবিধান ঋষি-কথিত শাস্ত্রে দেখিতে পাইব। মানবজাতির আজ যে এই সংমূঢ় অবস্থা—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে আজ সে দিশেহারা, তাহাকে পথ দেখাইবে একমাত্র শাস্ত্রই,—তাই শাস্ত্রের অধীন হইয়া তাহারই আদেশ নির্দ্দেশে আমাদের চলিতে হইবে। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "তস্মাচ্ছস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" এই সকল শাস্ত্রবাক্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তাই তাহাকে বুঝিবার জন্য প্রয়োজন হয় ভাষ্য এবং টীকার। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবন এবং আচার আচরণই শাস্ত্রের সেই টীকা ও ভাষ্য। অতএব তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিলেই কি ব্যক্তি কি জাতি যথার্থ মঙ্গল লাভ করিয়া ইহ ও পরকালে অভ্যুদয়শীল হইতে পারে। তাই শাস্ত্রমূর্ত্তি কুলদানন্দের জীবনের অপূর্ব্ব ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে জাতির আবাল-বৃদ্ধবনিতার সম্মুখেই উপস্থাপিত করিবার উদ্যোগী আমরা হইয়াছি। কুলদানন্দ ছিলেন জগতের অন্যতম ধর্ম্মগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিষ্য। গুরু নির্দ্দেশিত পথে চলিবার যে সংগ্রাম তাঁহাকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর করিতে হইয়াছে সে সংগ্রাম অভূতপূর্ব্ব—বিস্ময়কর। সে সংগ্রামের পথে চলিয়া তিনি শুধু ব্যক্তিগত জীবনই নহে, আমাদের সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা জাতীয় জীবনই গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

সমষ্টি ত ব্যষ্টির উপাদানেই গঠিত হয়। কাজেই ব্যষ্টির পক্ষে যাহা সত্য সমষ্টির পক্ষেও তাহাই সত্য। যোগীরাজ কুলদানন্দের জীবনের যে সাধনা তাহা শুধু তাঁহার একক জীবনের কল্যাণের জন্যই সাধিত হয় নাই সমষ্টি অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তাহা সাধিত হইয়াছে। তাই কুলদানন্দের জীবনবেদ—জাতির জীবন মরণের মূল কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এমন যে সর্ব্বাত্মভূত জীবন—তাঁহার জীবন-কথা মরণোন্মুখ জাতির পক্ষে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায়ই উপাদেয় এবং গ্রহণীয় হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ ধর্ম্মভিত্তিক জাতির প্রাণশক্তি তাহার ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির জীবন অবলম্বন করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া থাকে।

কুলদানন্দের আধ্যাত্মিক জীবন সুরু হয় অতি বাল্য বয়সে। সে সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় জয়কার। কুলদানন্দও ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া সমাজভুক্ত হইলেন। তখন শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষ—আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শত সহস্র নর-নারীকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গুরুবাদ মানে না—দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। কিন্তু গুরুদীক্ষাহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান ফলপ্রসূ হয় না ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধ মহাপুরুষগণের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য সিদ্ধান্ত। গোসাঁইজী দেখিলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্দ্দেশিত আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াও সত্যের বিমল জ্যোতিতে তথা ভগবৎ প্রসাদে তাঁহার হৃদয় মন পূর্ণ হইয়া উঠিল না। তখন শাস্ত্র নির্দ্দেশিত গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিলেন। গুরু লাভের জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আকুল প্রাণের সরল প্রার্থনা অবশেষে পূর্ণ হইল—তিনি সিদ্ধগুরু লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন। যে গুরু-বাদকে ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষায় কুসংস্কার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিলেন তাহা যে ভ্রান্ত ধারণা গুরু লাভের কৃতকৃতার্থতায় তাহা উপলব্ধি

করিলেন। সিদ্ধিতে এইবার নিজেও গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীক্ষা দানে অগণিত নরনারীর ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ করিতে লাগিলেন। এমনি প্রয়োজনে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমিতে জীবন গঠন করিবার আকুল আগ্রহে একদিন কুলদানন্দও আসিয়া গোসাঁইজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আরম্ভ হইল সাধন-সংগ্রাম। সে সংগ্রামে আছে জয়; আছে পরাজয়,—আছে উত্থান, আছে পতন। সেই জয়-পরাজয়, উত্থান পতনকে সমভাবে গ্রহণ করিয়াই সে সংগ্রামের শেষ—বিজয়ীর বরমাল্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সংগ্রামে যখন আসে অবসাদ—আসে ক্লৈব্য—সংগ্রামের ভীষণতা যখন অতি বড় বীর হৃদয়কেও কম্পিত করিয়া তুলে—ভয়ে পশ্চাদপদ হইবার চিন্তা হৃদয় মনকে অধিকার করিয়া বসে তখন জীবনরথের সারথি গুরুই "মাভৈঃ মন্ত্রে" শিষ্যকে—সাধককে গন্তব্যস্থলের দিকে আগাইয়া নিয়া চলেন।

কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বীরবর অর্জ্জুনের যখন বুদ্ধিসংমূঢ়, হৃদয় কম্পিত, কর্ত্তব্যের প্রতিপদক্ষেপে পদদ্বয় স্খলিত তখন বিশ্বগুরু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার রথের সারথি এবং গুরুপদে বৃত হইয়া অর্জ্জুনকে সংগ্রাম সাগর উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মচ্যুত অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য—ভয় ও নিরাশায় অভয় ও আশার সঞ্চার করিবার জন্য তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই জগতে অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রন্থ গীতারূপী বিশ্বগুরুর মূর্ত্তবাণী। ঠিক তেমনি কুলদানন্দের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের কঠোর ও কঠিন সংগ্রামে বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বগুরু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পথের নির্দ্দেশ দিয়া 'মাভৈঃ মন্ত্রে' তাঁহার হতাশ হৃদয়ে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও গীতারই ন্যায় যুগ যুগ ধরিয়া মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আগাইয়া নিয়া চলিবে। সেই সকল অমূল্য উপদেশ শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কুলদানন্দের ন্যায় সত্যসন্ধ পুরুষ যুগে যুগেই

বিরল। তাঁহার স্বলিখিত দিনলিপিতে (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ পাঁচ খণ্ড) যে আত্মবিশ্লেষণ এবং ত্রুটী বিচ্যুতির সত্যপ্রকাশন রহিয়াছে জানিনা জগৎ ইতিহাসে তাহার তুলনা আছে কিনা। এমন একজন সিদ্ধ সাধকের জীবনে যে সকল অপূর্ব্ব ঘটনা তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী মহারাজ স্বীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়া গত চার বৎসর যাবৎ সুদর্শনের পাঠক পাঠিকাগণের মনোরঞ্জন এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন সে সকল নিবন্ধই সঙ্কলন করিয়া আমরা যোগীরাজ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ পুস্তক রচনা করিয়াছি এবং দেশের ও দশের কল্যাণ কামনায় তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিতেছি। গ্রন্থের শেষ নিবন্ধ দুইটি পূর্ব্বপ্রকাশিত নহে, নূতন সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কুলদানন্দের ধারাবাহিক জীবনী নহে,—সামান্য কয়েকটি ঘটনার সঙ্কলন মাত্র। পাঠক এই ঘটনার সূত্র ধরিয়াই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনসমুদ্রে অবগাহন করিতে উৎসুক হইবেন ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ব্রহ্মচারী শিশির কুমার।



ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
(পরমহংস শ্রীশ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী, জটিয়া বাবা)

অগ্নি-পরীক্ষা

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের বৈচিত্র্যময় পুণ্য সাধক-জীবনের একটি ঘটনা আজ বলিব।

বাংলা ১৩০৫ সালের কথা। ব্রহ্মচারিজী তখন তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিজীর সহিত পুরীধামে বাস করিতেছেন। সেই সময় ব্রহ্মচারিজী মহারাজের জনৈকা গুরু-ভগ্নীও ঐ আশ্রমেই থাকিতেন। তিনি বিধবা, বয়স বেশী নয়। বৈধব্যদশাকে উপেক্ষা করিয়া যৌবনশ্রী তাঁহার সুন্দর দেহের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্যের সহিত ইনিও প্রতিদিন সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেন। দৈবক্রমে একদিন স্নানকালে গুরুভগ্নিটি অধঃস্রোতে পড়িয়া নিমিষের মধ্যে অগাধ জলরাশির বক্ষে এতদূরে গিয়া পড়িলেন যে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার চেষ্টা বৃথা মনে করিয়া তীরস্থিত সকলেই 'হায়! হায়'!! করিয়া উঠিল।

সকলের হাহাকার শুনিয়া স্নানরত ব্রহ্মচারিজীর দৃষ্টি পতিত হইল দূরে নিমজ্জমানা গুরুভগ্নিটির উপর। চকিতের মধ্যে তিনি বিপুল বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন বিশাল জলরাশির দুরন্ত

তরঙ্গের বুকে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে তীরস্থ সকলেই মুহূর্ত্ত গণিতে লাগিল। একজনের তো সলিল-সমাধি হইয়াছেই, বুঝি বা ঐ নবীন সাধুরও আজ প্রারব্ধ পূর্ণ হইল!

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারিজী যখন গুরুভগ্নীটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া নিয়া আসিয়া তীরে উঠিলেন, তখন সমবেত জনতা নিজেদের চক্ষুকেও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

নাই পারুক। তবু এ অসম্ভবও সম্ভব হইল। বিনা কারণে নয়—বিশেষ কারণেই। মহাপুরুষদের জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা শ্রদ্ধাসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ কারণেই ঐগুলি ঘটিয়াছে এবং লোকশিক্ষার প্রয়োজনেই সে সকল ঘটিয়া থাকে।

কথায় আছে, সযত্ন-বর্দ্ধিত বিষবৃক্ষের উপরও আপনা হইতেই হৃদয়ের টান জন্মিয়া থাকে; আর এক্ষেত্রে বৃক্ষ-লতাদির কথা নয়, একটি মনুষ্য-জীবনের কথা। অতএব ব্রহ্মচারিজীর স্বাভাবিক স্নেহ বা অনুকম্পা যে এই গুরু-ভগ্নীটির সম্পর্কে বিশেষভাবেই প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুধু তাহাই নহে। গুরুভগ্নীটির কথাও চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। যাঁহার কৃপায় মৃত্যুমুখ হইতে পুনর্জ্জীবন লাভ হইল, অন্তরের কৃতজ্ঞতা যে তাঁহার উপর সঞ্চিত হইতে থাকিবে, ইহাও তো মনেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু দরিদ্র বিধবার এই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য কোথায়? সর্ব্বহারা আশ্রয়হীনা ভগ্নীটি গোস্বামিজীর

আশ্রমে একজন আশ্রিতা মাত্র। সহায় সম্বলহীনার কৃতজ্ঞতা অভিব্যক্তির সকল পথই যে রুদ্ধ। কিন্তু সামর্থ্য নাই বলিয়া মন তো নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। আশ্রমে যেদিন যে প্রসাদ মিলিত, তারই ভিতর হইতে যেটুকু উৎকৃষ্ট তাহা তিনি সযত্নে পৃথক করিয়া লুকাইয়া রাখিতেন কখন ব্রহ্মচারিজীর আহারের সময় হইবে সেই প্রতীক্ষায়। দিনান্তে ব্রহ্মচারিজী যখন আহারে বসিতেন, সকলের অলক্ষ্যে অতি সন্তর্পণে তিনি রাখিয়া যাইতেন তাঁহার সেই সযত্ন-সঞ্চিত শ্রদ্ধার নিবেদন, আহার্য্যের এক পার্শ্বে।

কিন্তু লুকাইব বলিলেই কি লুকাইয়া রাখা যায়! সংসারের জ্বালাময় বিষদৃষ্টি যে সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়েই জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে ইহা তো তিনি বুঝেন নাই। ফলে বাহিরের সংসার জাগিয়া উঠিল পবিত্র আশ্রমের মধ্যেও তাহার শ্যেনদৃষ্টি ও ক্ষুরধার জিহ্বা লইয়া। তাহার জিহ্বাকণ্ডূয়ন তৃপ্ত হইতে লাগিল মিথ্যা কুৎসা রটনায় আর আশ্রমের পবিত্রতা কলুষিত হইতে লাগিল মিথ্যা অপবাদের কলঙ্ককালিমায়; এই ক্রম-বর্দ্ধমান অশান্তি অবশেষে ব্রহ্মচারিজীকেও স্পর্শ করিল। কুৎসিত কুৎসার বিষয় তাঁহারও আর অবিদিত রহিল না। কঠোর তাপস-জীবনের তীব্র তপশ্চর্য্যার মধ্যেও একি বিড়ম্বনা! ঠাকুরের একি খেলা, একি নূতন পরীক্ষা! নিজের অন্তরের অন্তস্থলে তিনি অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন যদি বা কোথাও এতটুকু গ্লানি তাঁহার অজ্ঞাতসারে আত্মগোপন করিয়া থাকে। কিন্তু কই? শত চেষ্টাতেও ত তাঁহার শুভ্র নির্ম্মল মনোদর্পণের কোথাও

ক্ষীণাতিক্ষীণ মলিন রেখাও দৃষ্টিগোচর হয় না! তবে কি এতগুলি আশ্রমবাসী গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নী ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যা অপবাদের সৃষ্টি করিতেছেন? কথায় আছে, যা রটে তার কিছু সত্য বটে। ইহা বহু প্রচলিত প্রবাদ বাক্য; ইহাও কি মিথ্যা হইতে পারে? কারণ অবশ্যই একটা আছে, যাহা এমনভাবে আত্মগোপন করিয়া আছে শত চেষ্টাতেও ধরা পড়িতেছে না।

আশ্রমের মধ্যে গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নীদের মর্ম্মান্তিক নিন্দা ও শ্লেষের বাণ অহরহ ব্রহ্মচারিজীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু যাঁহার উদ্দেশ্যে এত শ্লেষ, এত নিন্দা, এত আলোচনা, তিনি ধীর ও স্থির। তাঁহার অন্তর্জগতে তখন চলিতেছে সতর্ক আত্মান্বেষণ ও নির্ভীক আত্মবিশ্লেষণ। কি পূত পবিত্র মহান্ চরিত্র! কি অপূর্ব্ব লোকশিক্ষা!

একদিকে নিজের অন্তরকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও এই সকল অপবাদের মূল কারণ কোনরূপেই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, অন্যদিকে আবার হঠাৎ তাঁহার মনোমধ্যে কোন দুষ্টভাব আবিষ্কৃত হইল না বলিয়াই যে সকলে নিছক মিথ্যাকুৎসা রটনা করিতেছে, ইহাও তাঁহার মন স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। এমনও তো হইতে পারে যে, ঐ গুরুভগ্নীটিরই মনের নিভৃত কোণে কোথাও হয়তো বা তাহারও অজ্ঞাতসারে কোন অসৎভাব অঙ্কুরিত হইতেছে। সে মনের কথা তো তাঁহার জানা নাই!

একদিন শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে ব্রহ্মচারিজী ও এই গুরুভগ্নীটি

উভয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতেছেন। এমন সময় ব্রহ্মচারিজী ডাকিলেন—"দিদি"।

সেই জলদগম্ভীর সম্বোধনে গুরুভগ্নীটি চমকিত হইয়া ব্রহ্মচারিজীর মুখের দিকে চাহিলেন।

ব্রহ্মচারিজী বলিলেন—"এই জীবন্ত বিগ্রহের সামনে শপথ করে বলো দিদি, আমার উপর তোমার কোন দূষিত ভাব নেই?" কথা কয়টি শ্রবণগোচর হওয়া মাত্রই "বাবা! বাবা!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভাগ্যলাঞ্ছিতা গুরুভগ্নীটি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মন্দির মধ্যে লুটাইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মচারিজী ছলছল নেত্রে বলিতেছেন—"এস দিদি এই জীবন্ত বিগ্রহকে সাক্ষী রেখে দু'জনে শপথ করি, আজ থেকে তুমি আমার মা, আর আমি তোমার সন্তান। কেহ জানিল না, শুনিল না, শপথ গ্রহণ করা হইল। কিন্তু আশ্রমের আগুন নিভিল না। উত্তরোত্তর উহা এমন বৃদ্ধি পাইল যে স্বয়ং গোস্বামিজীর বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণীই একদিন এই গুরুভগ্নীটিকে মর্ম্মভেদী অপমান করিয়া বসিলেন।

ইহার পর আর আশ্রমবাস সম্ভব নয়। সহায় সম্বলহীনা দীনা গুরুভগ্নীটি অনন্যোপায় হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হইলেন আশ্রমের দ্বারের দিকে। আজ পথই তাঁহাকে ডাকিয়াছে—পথই তাঁহার আশ্রয়। এত বড় পৃথিবীতে আর তো তাঁহার অন্য কোনও ঠাঁই নাই।

সহৃদয় ব্রহ্মচারিজী বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এক্ষণে

তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন ধ্যানমগ্ন গোঁসাইজীর নিকট।

"ঠাকুর! আপনি তো বেশ স্থির হয়ে বসে আছেন। আপনি কি দেখ্‌ছেন না আশ্রমের সকলে ষড়যন্ত্র করে ওই অনাথিনীকে পথে তাড়িয়ে দিচ্ছে—ওর কি হবে ঠাকুর? আমার অপরাধ থাকিলে আপনি আমাকে ত্যাগ করুন, আমি পুরুষ মানুষ, ভিক্ষা করে চালিয়ে নেবো, অল্প বয়সের অসহায় এই ভগ্নীটিকে আপনার সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন না বাবা!"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না, দুঃখে অভিমানে, ক্রোধে কণ্ঠ তাঁহার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। শুধু দরবিগলিতধারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল তাঁহার দরদের অশ্রুধারা।

ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল। গোস্বামিজী সর্ব্ব-সমক্ষে সকলকে তিরস্কারপূর্ব্বক করুণাবিগলিত কণ্ঠে হত-ভাগিনীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ মা, আমি সমস্তই জানি। দিনের পর দিন কিভাবে তোমাকে চোখের জলে ভাসতে হচ্ছে কিছুই আমার অবিদিত নাই। মানুষ দিনকে রাত করতে পারে। তোমার অল্প বয়স, সারা জীবন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই চলতে হবে। তাই তোমাকে ঘাতসহ করে নেওয়ার জন্যই এতদিন চুপ করে ছিলাম। যতদিন বাঁচবে এই সেবা ত্যাগ করে কোথাও যেও না। এই 'লক্ষ্মণের গণ্ডী' পার হ'লেই সমূহ বিপদ্।" পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ব্রহ্মচারী! অমনি করেই আত্মবিশ্লেষণ করবে। যা কিছু শুনবে তার মধ্যে কিছু সত্য থাকলে নিজেকে সংশোধন

করে নেবে, মিথ্যা হলে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চল্‌বে, কদাপি প্রতিবাদ করবে না। সারা জীবন আমার এই কথাগুলি মনে রেখো।"

যুগ-পাবন গোস্বামিজী এই একমাত্র শিষ্যকে স্বহস্তে নীলকণ্ঠবেশে সাজাইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মচারিজী পরবর্ত্তী জীবনে শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন, কিভাবে জগতের হলাহল নির্ব্বিকারে পান করিয়া কলিহত জীবকে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থরূপী সঞ্জীবনী সুধা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না।

বলা বাহুল্য সুযোগ্যা শিষ্যাটিও শ্রীগুরুর আদেশ মত সারা জীবন আশ্রমের সেবায় আদর্শ জীবন কাটাইয়া অল্প দিন হয় দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

——:০:——

দেবভাষায় কথোপকথন

সাধু মহাপুরুষদের জীবনকথা বলিতে গেলে এমন সব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিতে হয়, যাহা সাধারণের নিকট অনেক সময় অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের জীবন সাধারণের মতন হইতে পারে না—হইলে তাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া আখ্যাত হইবেন কেন? কাজেই জগতের যে কোন মহাপুরুষের জীবনীই আমরা পর্য্যালোচনা করি না কেন, দেখিতে পাইব, তাঁহাদের জীবনে আমাদের স্থূল বুদ্ধির অনধিগম্য এমন সব অলৌকিক ঘটনা রহিয়াছে যাহা অবগত হইলে আমরা বিস্ময়াভিভূত না হইয়া পারি না। এইরূপ একটি ঘটনা পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি। ঘটনাটি আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, কাজেই নিঃসঙ্কোচে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের কথা। পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজী মহারাজ অসুস্থ। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গয়ায় লইয়া যাওয়া হয়। সঙ্গে আমরা অনেকেই ছিলাম। তন্মধ্যে

ডাঃ হরিশ সেন, জিতেন্দ্র মোদক, মহানন্দ নন্দী, বসন্ত ভট্টাচার্য্য যোগেশ ব্রহ্মচারী, বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়ার নাম মনে পড়িতেছে। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নীচে এক ইঞ্জিনিয়ারের মস্ত বড় একটি বাগানবাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। বাড়ীটি খুব নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানে চোর ডাকাতেরও ভয় ছিল। এদিকে আমাদের সঙ্গে বড় ঘরের বহু গুরুভগ্নী ছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কারপত্রও ছিল। কাজেই চোর ডাকাতের উপদ্রব হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া প্রতিদিন রাত্রে চোর ডাকাতকে ভয় দেখাইবার জন্য দু'বার করিয়া বন্দুকের আওয়াজ (Blank fire) করা হইত। গয়াতে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তথাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের আদেশ ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুমের ব্যাঘাত যেন কিছুতেই ঘটান না হয়।

একদিন রাত্র প্রায় দেড়টায় আমি বন্দুকের আওয়াজ করিবার জন্য বাহির হইয়াছি ; শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের পাশ দিয়া যাইবার সময় শুনিলাম ঠাকুর যেন কার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। গভীর রাত্রে কেহ তাঁহার ঘুমের ব্যাঘাত করিয়া গল্প করিতেছে মনে করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। লোকটিকে দেখিবার জন্য পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম—শ্রীশ্রীঠাকুর হাত মুখ নাড়িয়া কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন ; অথচ আমি ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইলাম না। পূর্ব্ব দিকের জানালায় গিয়া ভিতরটা ভাল করিয়া

দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘরেও কোন লোক দেখিতে পাইলাম না। অথচ শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলিতেছেন। ব্যাপারটা কি বুঝিতে না পারায় কৌতূহল বাড়িয়া চলিল। মনে হইল উত্তর দিকের জানালা দিয়া দেখা যাউক। কিন্তু সেদিক দিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, তখন ঐখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও কথা বলিতেছিলেন। মন দিয়া শুনিতে গিয়া দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর যে ভাষায় কথা বলিতেছেন,—তাহা বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত বা আমাদের জানা শোনা কোন ভাষাই নহে। অথচ ভাষাটি অতি মিষ্ট—শুনিলে কান জুড়াইয়া যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বলিলাম, "বাবা! কবিরাজ ত রাত্রে জেগে থাকতে বিশেষ ক্বরে বারণ করেছেন, তা সত্ত্বেও আপনি না ঘুমিয়ে কথা বলছেন, এতে আপনার শরীর খারাপ হবে।" তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "কে—গঙ্গানারায়ণ? ভিতরে এসো।" এই বলিয়া ছলছল নেত্রে বলিতে লাগিলেন, "দেখ বাবা! যখন আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে থেকে সাধন ভজন করতাম তখন সম্পূর্ণ আকাশ-বৃত্তি ছিল। কোন দিন কিছু জুটত—কোন দিন বা সামান্য একখানা টিক্কর মাত্র জুটত, তবুও শরীর কত সুস্থ ছিল। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে মহাপুরুষদের দর্শন করে আসতাম। শরীর এত হাল্‌কা বোধ হ'ত যে মনে হত যেন উড়ে চলেছি। কিন্তু মহাপুরুষদের কৃপার কি অবধি আছে? তাইতো কৃপা করে এখন তাঁরা আমাকেই দর্শন দিতে আসেন। এ সময় কি ঘুমিয়ে কাটান যায়?" আমি—

"মহাপুরুষদের দর্শন করার অধিকার কি আমাদের একেবারেই নেই? আমি তো কাউকে দেখতে পেলুম না—যে ভাষায় কথা বল্লেন, তাও বুঝতে পারলুম না।" শ্রীশ্রীঠাকুর—"ও! তুমি ভাষাও শুনেছ নাকি? ও কিছু নয়। ও দেবভাষা। মহাপুরুষদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা! ইচ্ছা করলে দর্শন দিতেও পারেন—আবার নাও দিতে পারেন।"

তার পরদিন আমি সবাইকে এই ঘটনা বলি। তখন অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাত্রি জাগিয়া ঐরূপ কথা শুনিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আর কেহ শুনিতে পাইলেন না। তবে মহানন্দ'দা বলিয়াছিলেন, "এ আমার বহু দেখা—তোমরা নূতন দেখ্‌ছ, দেখ!" অহংকারের বসে আমরা নিজেদের সবজান্তা—কত বড় বুদ্ধিমানই না মনে করি। কিন্তু মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ হইলে তাঁহাদের এমন সব ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়, যাহাতে মিথ্যা অভিমান আর অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

——:o:——

রঙ্গে অনঙ্গ

বস্তুর স্বরূপ—যথার্থ তত্ত্ব—স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না ; তাই স্থূল দৃষ্টিতে গুরু সাধারণ মানুষ। সাধারণেরই মতন তিনি চলেন ফিরেন—আহারে বিহারে সাধারণ মানুষ যেরূপ করিয়া থাকেন, তদ্রূপই করিয়া থাকেন। কিন্তু তত্ত্বতঃ গুরু হইলেন "পরং ব্রহ্ম" বা "ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্"। এতো স্থূল দৃষ্টিতে নয়, অন্তর্দৃষ্টিতে—যথার্থ দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টি ত সহজে লাভ হয় না। সে দৃষ্টি পাইতে হইলে চাই সাধনা। সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশে সাধন ভজনে চিত্ত-মল বিদূরিত হইলে সিদ্ধিতে স্বরূপদর্শনের এই সত্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত "গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্ গুরোঃ পরতরং নাস্তি" এই তত্ত্ব বোধগম্য হয় না—আর হয় না বলিয়াই মানুষী বুদ্ধিতে তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া আমরা ভীষণ ভ্রমে পতিত হই এবং সেই ভ্রমের দরুণ জীবনে কত রকম দুঃখ দুর্ভোগই না ভুগিয়া থাকি। এইরূপ একটি ঘটনার কথা আজ মনে পড়িতেছে। ঘটনাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীর) শ্রীমুখে শোনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড় চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন, বিশেষতঃ নিজের সম্বন্ধে সহজে কিছু বলিতে চাহিতেন না।

১৩৩৫ সাল। চন্দননগরে মহাহোমের পরের ঘটনা। একদিন নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘটনাগুলি মন দিয়া শুনিলেন, তারপর আমাকে সাধন ভজনে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার জীবনের একটি অদ্ভুত ঘটনা আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই এখানে বলিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "গোঁসাই আমাকে প্রথম ব্রহ্মচর্য্য দেন এক বৎসরের জন্য। ব্রহ্মচর্য্য দিয়া বলিয়াছিলেন, 'বার বৎসর এইভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হয়।'

দ্বিতীয় বৎসরে বলিলেন, 'যে ভাবে চলিতেছ তাহাতে তোমার বার বৎসর লাগিবে না, নয় বৎসরেই কাজ শেষ হইবে।'

তৃতীয় বৎসরে আমার সাধননিষ্ঠার খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'এইভাবে চলিলে ছয় বৎসরেই তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে।'

প্রশংসার অহম্ অভিমানে নিশ্চয়ই স্ফীত হইয়া থাকিব। কিন্তু পরম দয়াল গুরুদেব তাহা চূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গোঁসাই (বিজয়কৃষ্ণজী) হ্যারিসন রোডের একটি বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে আছি। তাঁহার সেবার অধিকাংশ কাজই আমি করিয়া থাকি। সমস্ত দিন সেবার কাজ নিয়াই ব্যস্ত থাকিতাম।

আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই একটি গলি ছিল এবং গলির

অপর দিকে একটি বাড়ী ছিল। ঐ বাড়ীর একটি ঘর এবং আমাদের বাড়ীর একটি ঘর সামনাসামনি ছিল। উভয় ঘরের জানালাও ছিল সামনাসামনি। এক বাড়ীর জানালায় দাঁড়াইয়া অপর বাড়ীর সব কিছু দেখিতে পাওয়া যাইত। আমাদের বাড়ীর এই ঘরটিতেই আমি থাকিতাম। আমার সম্মুখস্থ ঘরে একটি কুমারী বাস করিত। কুমারীটি বাঙ্গালী নহে,—পার্শী, অনিন্দ্য সুন্দরী। সেবার অবসরে আমি যখনই জানালায় যাইয়া দাঁড়াইতাম তখনই দেখিতে পাইতাম সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীটিও তাহার জানালায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমে তাহার এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকাটাকে আমি তেমন কিছু মনে করি নাই। কিন্তু তাহাকে প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইতাম। আমিও তাহাকে দেখিতাম। উদাসীন ভাবেই দেখিয়া যাইতাম—ব্যাপারটাকে তেমন কিছু গুরুত্ব দিতাম না। এমনি করিয়াই দিন যাইতে লাগিল। একে অন্যকে জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিয়া থাকি। নিজের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করায় এবং মনের মধ্যে কোনরূপ বিকার জন্মিয়াছে বুঝিতে না পারায়, ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী আমার পক্ষে একটি যুবতীকে এইভাবে দর্শন করা যে মহা অন্যায় তাহা মনে না করিয়া আত্মপ্রতারণা করিতেছিলাম। এই আত্মপ্রতারণা কতকটা জ্ঞানতঃ কতকটা অজ্ঞানতঃ হইতেছিল। আরও কিছুদিন এইভাবে কাটিল—বুঝিলাম আমি ফাঁদে পা দিয়াছি। কিন্তু এই জাল ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিবার কোন ইচ্ছাই হইল না। সময়ে অসময়ে তাহাকে দেখিতে না পাইলে অস্থির হইয়া উঠি—

জীবন শূন্য বোধ হয়। যুবতীটি ছিল অপূর্ব্ব সুন্দরী তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহার বেশভূষার বাহারও বড় কম ছিল না। দিনের মধ্যে কতবারই না তাহার বেশভূষার পরিবর্ত্তন হইত। বড় ঘরের মেয়ে। তাহার প্রসাধনের সাহায্যের জন্যই দু'তিনটি সেবাদাসী ছিল। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় তাহাকে এক পোষাকে দেখা যাইত না। এক এক সময় এক এক রকম পোষাকে তাহাকে দেখা যাইত। এই মোহিনী মূর্ত্তি আমাকে আত্মহারা করিল। যুবতীর রূপজ মোহে মোহিত হওয়ায় আমার ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান তিরোহিত হইল। যুবতী আমার এই অবস্থা বুঝিতে পারিল। তাই একদিন নিঃসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, "আপনি এমন সুন্দর পুরুষ, এখন আপনার যৌবন কাল, ভোগের সময়। আপনি এভাবে আপনার জীবন নষ্ট করিতেছেন কেন? আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন আমি আপনাকে কত ভালবাসি। আমার যথাসর্ব্বস্ব মনে মনে আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। চলুন, আমরা কোথাও চলিয়া গিয়া স্বামী স্ত্রীর মতন বাস করি। অর্থের অভাব হইবে না। আমার যে সব অলঙ্কার আছে এবং আমার কাছে যে পরিমাণ টাকা পয়সা আছে তাহাতে শুধু যে আমাদের জীবনকালই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিবে তাহা নহে—আমাদের পরবর্ত্তী দু'এক পুরুষ কোনরূপ অর্থোপার্জ্জন না করিলেও দিব্বি আরামে জীবন যাপন করিতে পারিবে। আমাকে আপনি চরণে স্থান দিন—তাহা না হইলে আত্মহত্যা ছাড়া আর আমার কোন গতি নাই।"

আমার চিন্তা-রাজ্যে ভীষণ বিপ্লব দেখা দিল। এখন আমি

কি করি? প্রায় দেড়মাস কালের প্রতিটি দিন, সপ্তাহের প্রতিটি ক্ষণ মুহূর্ত্ত এইভাবে নিজেকে মোহের জালে জড়াইয়াছি। এখন সেই জাল হইতে বাহির হইয়া আসা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত।

অধ্যাত্ম-জগতে উন্নত হইয়া জীবন সার্থক করিব আবাল্যের এই আশা আকাঙ্ক্ষা সবই আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত। যাঁহার আশ্রয়ে ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি, যাঁহার সেবায় দিন রাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেছি, তাঁহার সাহচর্য্যে থাকিয়াও আমার হৃদয়ে এই পাপবহ্নি ধূমায়িত হইয়া ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে গোঁসাই এ সকলের বিন্দু-বিসর্গ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না, বা জানিতে পারিলেন না। বহুলোক গোঁসাইকে অন্তর্য্যামী, ভগবান্, ইহ ও পরকালের উদ্ধারকর্ত্তা মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি আমার এই অধঃপতন দেখিতে পাইলেন না,—তখন অপর লোকের কি উপকার তাঁহার দ্বারা হইতে পারে? সুযোগ সুবিধা পাইলে সকল রকম পাপকার্য্যই আমার দ্বারা সম্ভব হইত, অথচ গোঁসাই এ বিষয়ে আমাকে এতটুকু সাবধান পর্য্যন্ত করিলেন না। ধর্ম্মজগৎ কি তবে বুজরুকী? গোঁসাইর কি কোন শক্তি নাই? এই সব চিন্তায় আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আমার সর্ব্বনাশ যা হইবার তা'ত হইয়াছেই; কিন্তু একটি কুমারীর জীবনকে এভাবে কলুষিত করিবার কি অধিকার আমার ছিল? অথচ আমাকে

উপলক্ষ্য করিয়া যুবতীটির অন্তর্জগতে যে বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহাতে তাহারও সর্ব্বনাশের আর কিছুই বাকী নাই।

একদিন গোসাঁই পায়খানায় গিয়াছেন; আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া এই সব কথা ভাবিতেছি। ভাবিতে ভাবিতে একেবারে উন্মাদপ্রায় হইয়া গেলাম। আমার কাণ্ডজ্ঞান তিরোহিত হইল। কি করিব না করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে একটা প্রকাণ্ড লাঠি যোগাড় করিয়া, তাহা হাতে লইয়া, গোসাঁইজীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে তখন এই সঙ্কল্প, গোসাঁই বাহির হইয়া আসিলেই এই লাঠির আঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিব। ধর্ম্মজগতের যত সব ভণ্ডামি প্রকাশ করিয়া দিব। পাগলের ন্যায় এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম গোসাঁই পায়খানায় বসিয়াই উচ্চরবে হাসিতেছেন। তারপর হাসিতে হাসিতেই বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ব্রহ্মচারী! স্থির হও, স্থির হও। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতিটি ঘটনা আমি অবগত আছি। শিষ্যের প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাসের খবর গুরুকে রাখিতে হয়। তুমি কোন্ দিন, কোন্ সময় কি করিয়াছ না করিয়াছ সবই আমি জানি। সবই আমি একে একে বলিয়া যাইতেছি, তুমি শুনিয়া যাও" এই বলিয়া কেমন করিয়া পাপ আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিল, কেমন করিয়া আত্মপ্রতারণার দ্বারা নিজের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়াছিলাম, একে একে তিনি সবই বলিয়া

যাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতের সামান্য একটি নিয়মও অবহেলা করিলে মানুষ কিভাবে নিরয়গামী হয়, অষ্টপ্রকার মৈথুন হইতে দূরে না থাকিলে যে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়া থাকে সবই তিনি বলিয়া গেলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি,—বুঝিলাম, আমার জীবনের কোন কিছুই তাঁহার নিকট গোপন নাই। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলাম। দয়াল গুরু আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল—আমার সকল পাপতাপ যেন নিঃশেষে মুছিয়া গেল। সেই পবিত্র স্পর্শ আমাকে শুচি শুভ্র, পূত পবিত্র করিয়া দিল। আমার নূতন জীবন লাভ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে, বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হইল, কিছুই বলিতে পারিলাম না। কেবলই মনে হইতে লাগিল, গুরু দয়াল, পরম দয়াল—শ্রীশ্রীঠাকুর, কাহিনী সমাপন করিয়া বলিলেন,—"আমার ডায়েরীতে এই ঘটনাকে "রঙ্গে অনঙ্গ" নাম দিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি, সুযোগমত পড়িতে পারিবে।

সৎসঙ্গে সাপও অহিংস

"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" ; অহিংসাবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের সম্বন্ধে অপর সমুদায় জীবের হিংসাবৃত্তি দূরীভূত হয়। পাতঞ্জল দর্শনের এই সূত্রটি পড়িয়া কত সময় মনে সন্দেহ জাগিয়াছে, এও কি সম্ভব? এক দিন দয়াল গুরু শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে নিজ জীবনে তাহা প্রমাণ করিয়া আমার ন্যায় অনেকেরই এ বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। সেই অদ্ভুত ঘটনাটি আজ শ্রীসুদর্শনের পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি। আমাদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট এই কাহিনী পাঠ করিয়া, আশা করি তাঁহারা চমৎকৃত হইবেন, এবং শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবেন।

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আশ্রম—পুরী ঠাকুর বাড়ী। সতীর্থ নীলমণিদা ও হারাধনদা এক দিন দুজনে মিলিয়া আশ্রমে একটা মস্ত বড় গোখরা সাপ কৌশলপূর্ব্বক ধরিয়া একটা হাঁড়িতে পুড়িলেন। আশ্রমে জীবহিংসা নিষেধ কাজেই সাপটাকে বধ করা চলিবে না। সাপটাকে আশ্রম হইতে বহু দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে ইহাই স্থির হইল। দোতলায় দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সমস্ত দেখিতেছিলেন ; কিছুক্ষণ

পর তিনি নামিয়া আসিলেন এবং নীলমণিদা ও হারাধনদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের এই দুর্বুদ্ধি হল কেন? আশ্রম ত বহু দিন হয়েছে,—এই স্থানে কত বনজঙ্গল ছিল, কোন দিন কোন সাপ তোমাদের হিংসা করেছে কি? বনে জঙ্গলে সাধু সন্ন্যাসীরা ঘুরে বেড়ান—গভীর অরণ্যে কত সাধু মহাপুরুষ বাস করেন কিন্তু সাপে বা বাঘে তাঁদের অনিষ্ট করেছে এইরূপ ত শোনা যায় না; অন্তর শুদ্ধ হলে কেহই অনিষ্ট করে না।" তারপর পুনরায় বলিলেন "একে ছেড়ে দাও।" তখন নিলমণিদা সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কে ছাড়তে যাবে? ছাড়তে গেলেই কামড়াবে। সাপটা ভীষণ রেগে আছে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় কি জানি কেহ সাপটাকে ছাড়িয়া দেয় এই ভয়ে সকলেই ছুটিয়া পলাইল। আমিও ভয়ে ২০।২৫ হাত দূরে বারাণ্ডায় গিয়া উঠিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু নির্বিকার—নিশ্চিন্ত। কোন কিছু বিশেষ ঘটনা যে ঘটিয়াছে বা ঘটিবে তাঁহার হাবভাবে তাহা মনে হইল না। সহজ ভাব, যেন কিছুই হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে আস্তে হাঁড়ির দিকে আগাইয়া গেলেন। হাঁড়ির কাছে গিয়া হাঁড়িটা কাৎ করিয়া দিলেন। সাপটা তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া ফোঁস করিয়া ফণা ধরিয়া দাঁড়াইল—কামড়ায় আর কি! ঠাকুর নির্ভয়—এক পাও নড়িলেন না। হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা! এরা ছেলে মানুষ, না বুঝে অপরাধ করেছে। এ অপরাধ আমারই—তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং যথাস্থানে চলে যাও।" এদিকে সাপটাকে ছাড়িয়া দিয়াছে দেখিয়া আশ্রমের সবাই ভয়ে অস্থির,

কেহ কেহ লাঠি সোটা নিয়া উপস্থিত। সাপটা কিন্তু কাউকে কিছু করিল না,—ঠাকুরকে পরিক্রমা করিয়া আস্তে আস্তে বাগানের দিকে চলিয়া গেল। এত সময় আমরা ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছিলাম,—এইবার সকলেরই মুখে কথা ফুটিল। তখন মনে হইল, শাস্ত্রবাক্য যে সত্য তাহা সাধুপুরুষের সহচর্য্যেই বুঝিতে পারা যায়। এবং সাধু মহাপুরুষের জীবনই শাস্ত্রের যথার্থ ভাষ্য—শাস্ত্রার্থ বুঝিতে হইলে সাধু সঙ্গ—মহাপুরুষের সঙ্গ করা চাই।

——::#::——

বীতরাগভয়ক্রোধঃ

কটকের 'টেলিগ্রাফিষ্ট' বিনয় গাঙ্গুলী ছিলেন আমাদের গুরুভ্রাতা। আমিও তাহার সঙ্গে এক আপিসেই চাকুরী করিতাম। পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজী মহারাজ তখন পুরী আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। আমি গুরুভ্রাতা বিনয় গাঙ্গুলীকে নিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পুরী যাই। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া উভয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিবামাত্রই ঠাকুর বিনয়ের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "একি ! তোমার বীর্য্য যে একেবারে তরল হ'য়ে গেছে দেখছি, তুমি ত পাগল হ'লে বলে। তুমি লম্বা ছুটির দরখাস্ত কর। তীর্থস্থানে বাস, গঙ্গাস্নান, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ, সাধুদর্শন প্রভৃতি কর, তাতে যদি তোমার প্রারব্ধ কিছুটা ক্ষয় হয়, তা না হ'লে তোমার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার দেখছি।" কয়েক দিন পর আমরা কটকে ফিরিয়া আসিলাম। কটকে ফিরিয়া বিনয়কে শ্রীশ্রীঠাকুররের কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়া তদনুযায়ী কাজ করার জন্য প্রায়ই বলিতাম, কিন্তু বিনয় আমার কথা কানেই তুলিত না—আমার অনুরোধ উপরোধ সবই উপেক্ষা করিয়া চলিত। কিন্তু ঠাকুরের কথা ব্যর্থ হইবার

নয়, তুই তিন মাসের মধ্যেই বিনয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতির সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন আর উপায়ন্তর না দেখিয়া এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে নিয়া পুরী রওনা হইলাম। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া যাহাতে সে সমুদ্রস্নান, জগন্নাথদেব দর্শন এবং মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে সে বিষয়ে চেষ্টিত হইলাম।

এইভাবে কিছুদিন যায়—একদিন দেখিলাম বিনয় একটা মস্ত বড় ছুরী শান দিতেছে। যদিও দেখিলাম তথাপি আমার মনে কোনরূপ সংশয় জাগে নাই, কাজেই এ বিষয়ে তাহাকে কোন কথা বলি নাই বা কোন প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মশারী খাটাইয়া ছাতে শুইতেন—আমরাও আশেপাশে শুইতাম। সেদিন রাত্র ১টায় সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত। হঠাৎ ঠাকুরের কথা ও বিনয়ের কান্নার শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমরা যার যার বিছানায় উঠিয়া বসিলাম এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ঠাকুরের বিছানার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। আমাদের নীরব প্রশ্নের উত্তরে যাহা শুনিলাম তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বিনয় সেই শাণিত ছুরিকাটি নিয়া ঠাকুরকে খুন করিতে আসিয়াছিল। মশারী তুলিয়া ঠাকুরের দেহে ছুরিকাঘাত করিবার উপক্রম করিয়াছে—এমন সময় ঠাকুর মায়ের মতনই স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন, "কে বিনয়! এসো বাবা এসো" এই কথার মধ্যে কি শক্তি, কি যাদু ছিল জানি না—তাহার হাত হইতে ছুরিটা পড়িয়া গেল। বিনয় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ঠাকুরের পায় লুটাইয়া পড়িল।

ঠাকুর আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"আমি অপরাধ করেছিলাম কি না, তাই বিনয় আমাকে খুন করতে এসেছিল, এখন সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে, তোমরা তাকে ক্ষমা কর।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমরা বিস্ময়ে হতবাক হইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গীতার এই কথাগুলি মনে পড়িল ঃ—

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।

———

যোগক্ষেমং বহাম্যহম্

ছকুদাস মালাকারের বাড়ী ছিল চাঁদভাগ। তিনি মুগকল্যাণ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং গ্রামের পোষ্ট আপিসেও পোষ্টমাষ্টারের কাজ করিতেন।

দীক্ষার্থী হইয়া চন্দননগরে শ্রীশ্রীব্রহ্মচারিজী মহারাজের নিকট উপনীত হইলে ঐখানেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। সে সময়ে আরো অনেকের দীক্ষা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বহু শিষ্য এবং ভক্তেরও সমাগম হইয়াছিল। দীক্ষার পর ছকুদাস যথাসময়ে কার্য্যস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে এত লোকের ভিড়ের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য মাত্র ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই চিনিয়া রাখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার কথা ভুলিয়াই গিয়া থাকিবেন।

দুই স্থানে কাজ করাতে তাঁহার সংসারের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল—কোনরূপ অভাব অনটন তাঁহাকে ভুগিতে হইত না। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল এই জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নহে। ছকুদাসের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইল। দৈবদুর্ব্বিপাকে একে একে তাঁহার দুইটি কাজই চলিয়া গেল। সামান্য কিছু সঞ্চয় ছিল তদ্দ্বারাই সংসার চলিতে লাগিল। কিন্তু বসিয়া

খাইলে সঞ্চিত অর্থে আর কয় দিন চলে? দেখিতে দেখিতে তাহা শেষ হইয়া গেল। সংসার অচল—ঋণ ছাড়া আর উপায় নাই; অতএব ঋণ করিয়াই সংসার চালাইতে লাগিলেন। প্রায় ৪৫০৲ ঋণ হইল—ঋণও আর মিলে না। একেবারে নিরুপায়। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে স্ত্রীর পরণের বস্ত্রখানা শতচ্ছিন্ন এবং তাঁহার নিজের বস্ত্রের অবস্থাও তদ্রূপই। এখন উপায়? স্থূল দৃষ্টিতে কোন উপায়ই দৃষ্ট হইতেছে না। শাস্ত্র এবং সিদ্ধ মহাজনগণ বলেন বটে, যাহার কেহ নাই তাহার ভগবান্ আছেন—নিরুপায়ের উপায় ভগবান্। কিন্তু তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি কই? এই অবস্থায় জীবন দুর্ব্বিসহ—মৃত্যুকামনা ছাড়া অন্য কোন কামনাই থাকে না—ছকুদাসের অবস্থাও তদ্রূপ। উপায়ন্তর না দেখিয়া এক দিন রাত্রে ছকুদাস শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর সম্মুখে বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে দয়াল ঠাকুর! এইবার তুমি রক্ষা না করিলে আর কোন উপায় নাই,—না খাইয়াই মরিতে হইবে। কারণ কোথাও ধার মিলিতেছে না"; কাতর প্রাণের আকুল প্রার্থনা—অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত একাগ্র প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না কারণ ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(গীতা ৯।২২)

ছকুদাস আর্ত্ত, কাজেই তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও প্রার্থনা

সর্ব্বতোভাবেই একাগ্র না হইয়া উপায় ছিল না, ফলে গুরুরূপী ভগবান্ যোগক্ষেম বহন করার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাতেই অজানা অচেনা এক ভদ্রলোক আসিয়া ছকুদাসের বাড়ীতে উপস্থিত। ছকুদাস তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে, আগন্তুক ভদ্রলোক বলিলেন, "আমি পুরী হইতে আসিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার যে সকল পাওনাদার আছে তাদের সকলকে ডাকুন এবং কার কাছে কত দেনা আমি জানিতে চাই।" তাঁহার কথা শুনিয়া ছকুদাসের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। পরে কতকটা আত্মস্থ হইয়া বলিলেন, "ঋণের কথা বলিতেছেন কেন? সে কথা পরে হইবে, আগে হাত মুখ ধোন—স্নানাহার করুন।" "না, তাহা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ আছে ঋণ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করিতে পারিব না। এই নিন, ঠাকুর আপনার ও আপনার স্ত্রীর জন্য তুখানা কাপড়ও পাঠিয়েছেন।" আগন্তুকের কথা শুনিয়া ছকুদাসের তুই চোখ হইতে অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল। বুঝিলেন গত রাত্রের আকুল প্রার্থনা শ্রীগুরুচরণে পৌঁছিয়াছে। তাই দয়াল—পরম দয়াল গুরুদেব আজ তাহার তুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগন্তুকের আগ্রহাতিশয্যে তখনই বাজারে গিয়া সমস্ত পাওনাদারকে ডাকিয়া ঋণ শোধ করা হইল এবং তাহা করিয়া দিয়াই আগন্তুক চলিয়া গেলেন,—শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আর রাখা গেল না এবং তাঁহার নামধামও জানা গেল না।

পুরীতে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া চিঠি দেওয়া হইল, কিন্তু উত্তর আসিল, ঠাকুর কাহাকেও তাঁহার নিকট পাঠান নাই। ছকুদাসের আর সন্দেহ রহিল না যে ঠাকুর স্বয়ংই আসিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন—কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। এদিকে আর এক ব্যাপার সংঘটিত হইল। যে দিন ঋণ শোধ হয় সেদিনেই অপ্রত্যাশিতভাবে যে চাকুরী দুইটি হইতে পূর্ব্বে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল সেই দুই চাকুরীতেই পুনঃ তাঁহাকে বহাল করা হইল। ছকুদাসের এইবার মতের পরিবর্ত্তন হইল, মনে মনে বলিলেন, হাঁ, গুরু মস্তবড় ভিড়ের মধ্যে অল্পকালের জন্য দেখিলেও চিনিয়া রাখিতে ভুল করেন না কারণ গুরু যে নিত্যকালের নিত্য সঙ্গী।

মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অন্যের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের ন্যায় সমভাবে অনুভব করেন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

ব্রহ্মচারিজী মহারাজের জীবনের যে ঘটনাটি আজ শ্রীসুদর্শনের পাঠক পাঠিকাদের নিকট বলিতে বসিয়াছি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, উপরি-উক্ত শ্লোকে শ্রেষ্ঠ যোগীর যে লক্ষণের কথা ভগবান্ বলিয়াছেন, ব্রহ্মচারিজী মহারাজের জীবনেও সেই লক্ষণ বিরাজমান।

১৩৩৬ সালের পৌষ মাস। শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই অসুস্থ। বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে গয়া ব্রহ্মযোনি পাহাড় হইতে প্রায় ২৫।৩০ জন শিষ্য-শিষ্যাসহ শ্রীশ্রীঠাকুর রাজগীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিগম্বর জৈন ধর্ম্মশালায় উঠিলেন। দোতলার প্রায় সমস্ত ঘরগুলিই ব্যবহারের জন্য পাওয়া গিয়াছে—কাজেই কোন অসুবিধা নাই। সকলের সঙ্গে ঠাকুরও প্রতিদিন অতি

প্রত্যূষে রাজগীর উষ্ণ প্রস্রবণ কুণ্ডে স্নান করিতে যান। যাওয়া আসায় শারীরিক ক্লেশ খুবই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না। নিত্যকর্ম্ম এবং আহারাদির পর অধিকাংশ সময়ই তিনি ছোট জ্যাঠামশায় শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেবতী কাকা ও অন্যান্যদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। একদিন রাত্র ১০টা ১০৷৷০টা হইবে। হঠাৎ ঠাকুরের শরীরে ভীষণ কম্প দেখা দিল। সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া লেপ কম্বল প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দিলেন কিন্তু কম্প কিছুতেই উপশম হয় না। কাঠ কয়লার আগুন করিয়া পায় সেক দেওয়া হইতে লাগিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহ কেহ ডাক্তার ডাকিবার কথা ভাবিতেছেন, এজন্য পরামর্শ হইতেছে। এমন সময় আমাদের কারো কারো মনে হইল, অন্যের গায়ে কাঁটা ফুটিলে বা আঘাত লাগিলে অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ হইতে রক্তপাত হইয়াছে, এবং আঘাতের বেদনা তিনি অনুভব করিতেছেন। কাজেই মনে হইল নিকটেই কেহ ভীষণ শীতে কষ্ট পাইতেছে না ত, যার জন্য ঠাকুরের দেহেও সেই ক্লেশ দেখা দিয়াছে। এই কথা মনে হওয়া মাত্রই আমি এবং আমাদের অন্যতম গুরুভ্রাতা বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া ধর্ম্ম-শালার বাহিরে গিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সামান্য অনুসন্ধানের পরই দেখিতে পাইলাম, একটি চালায় ২।৩টি ভিক্ষুক শুইয়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে একজন প্রায় নগ্নদেহে শীতের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া ঠক

৭/৩॥

ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দুই খানি কম্বল আনিয়া তাহার গায়ে চাপা দিলাম এবং আগুন জ্বালাইয়া তাহার শরীর তাপিবার ব্যবস্থাও করা হইল। এইভাবে আগুনের উত্তাপ পাইয়া এবং কম্বলের গরমে ভিখারিটি কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইয়া উঠিল। তখন আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসিয়া দেখি, তাঁহার শরীরের কম্প চলিয়া গিয়াছে, তিনি স্বাভাবিক এবং বেশ সুস্থ।

তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে অনেক সময় বলিতে শোনা যায়, সাধু সন্ন্যাসীরা স্বার্থপর, নিজেদের নিয়াই ব্যস্ত; অন্যের সুখদুঃখের কোন ধার তাঁহারা ধারেন না, তাই সংসার ছাড়িয়া তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখসুবিধার জন্যই সাধন ভজন করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা কত ভ্রান্ত! কোন মহাপুরুষের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন। ভগবৎকৃপায় যদি কখনো তাঁহাদের প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ হয় তখন তাঁহারা এইরূপ কত ঘটনাই দেখিতে পাইবেন, এবং দেখিবেন সাধু-সন্ন্যাসীরা অন্যের সুখদুঃখ যেভাবে অনুভব করেন, সংসারী লোকেরা, তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যার দুঃখও তেমন করিয়া অনুভব করেন না। যাহা হউক, পরদিন সকালে বাল্যভোগের প্রসাদ পাওয়ার সময় এই ঘটনা নিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা হইতেছিল, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, একদিন যদি এখানকার সকল ভিক্ষুককে ভাল করিয়া খাওয়ান যায় এবং এক একখানা করিয়া কম্বল দেওয়া হয় তাহা হইলে বেশ হয়।

গুরুভ্রাতা চেৎলাঙ্গিয়া ঠাকুরের ঐ কথায় খুবই উৎসাহিত হইলেন এবং এ বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কম্বলের জন্য গয়াতে টেলিগ্রাম করা হইল। যথা সময়ে কম্বল আসিল। তখন একদিন টিকিট বিলি করিয়া ভিক্ষুকদের নিমন্ত্রণ করা হইল। খিচুরী, ছানার ডালনা, লাব্‌রা, অম্বল, মিষ্টি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈরী করান হইল। নিমন্ত্রিত ভিক্ষুকগণ পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিল এবং সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনি করিয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কত আনন্দ! সকলের মুখ দিয়া যেন তিনিই আহার করিলেন। তাইতো বলিতে হয় ঃ—

* * * * *

"সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ"

——ঃ০ঃ——

রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

ভগবান্ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তাঁহাকে যে কেহই বিনাশ করিতে পারে না, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভক্তরাজ প্রহ্লাদ। 'সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা ভগবান্।' মুখে আমরা অনেক সময় একথা বলি বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করিতে পারিলে জীবনের সমস্ত দায়দায়িত্ব ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু হায়! সে বিশ্বাস আমাদের কই? শক্তি নাই অথচ মিথ্যা কর্ত্তৃত্বের অহংকার আছে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, "অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" এই মিথ্যা কর্তৃত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ করিলে কি হয় সে কথাই বলিতেছি।

১৩০৯-১০ সালের কথা। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী তখন গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে কঠোর তপস্যায় রত। শৌচাদির প্রয়োজন ব্যতীত সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে তিনি আসন ত্যাগ করেন না। শয়ন ও নিদ্রা এককালে দুই-ই ত্যাগ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তি। অযাচিতভাবে কোন তীর্থ-যাত্রী আহার্য্য কিছু দিয়া গেলে তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। একেবারে নিরালম্ব—সকল ভার ভগবানের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে, ব্রহ্মচারিজীর সেদিকে দৃক্‌পাত নাই—নামানন্দে—ভজনে ডুবিয়া থাকেন।

স্থানটি লোকলোচনের বহির্ভূত—অতি দুর্গম। চোর ডাকাতের লুকাইয়া থাকিবার এবং তাহাদের অপহৃত বস্তু লুকাইয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া একদল দস্যু সেখানে তাহাদের আড্ডা গাড়িয়াছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্য লুকাইয়া রাখিবার জন্য দস্যুরা গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে সেখানে উপস্থিত হইত। তাহারা দেখিত, একজন সাধু সর্ব্বদাই সেখানে বসিয়া আছেন, নড়েন না, চড়েন না—কোথাও যান না, তাহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপ তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যদি পুলিশকে খবর দিয়া তাহাদের ধরাইয়া দেন এই আশঙ্কায় তাহারা মনে মনে ভীত হইল। কি করিয়া সাধুকে সেই স্থান হইতে তাড়ান যায় ভাবিতে লাগিল। প্রথমে নানারূপ ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহিল। কিন্তু তাহা যখন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল, তখন তাঁহাকে মারিয়া ফেলাই ঠিক করিল। এক দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য এক রাত্রে বৃহৎ লাঠি হস্তে পার্শ্ববর্ত্তী বেলগাছ তলায় লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দৈবের এমনি বিধান, এক পাহাড়িয়া বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিল। অসহ্য যাতনায় সে কাতর। বৃশ্চিক-দংশন মৃত্যু-যন্ত্রণা নিয়া তাহার নিকট উপস্থিত। ব্রহ্মচারিজী যে দস্যুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে তবুও আততায়ীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি ঔষধ দিয়া সেই দুর্ব্বৃত্তকে সুস্থ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও দস্যুদের চৈতন্য হইল না। ব্রহ্মচারিজীকে পাহাড় হইতে না সরাইতে পারিলে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। কাজেই আরেক বুদ্ধি

করিল। তাঁহাকে কয়েকজন বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিয়া এক স্থানে আটক করিয়া রাখিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একদিন কয়েকজন দস্যু ব্রহ্মচারিজীর কুটিরের পার্শ্বে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহারা দেখিল একটি মস্তবড় ভীষণদর্শন চিতাবাঘ তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অন্য উপায় না দেখিয়া ব্রহ্মচারিজীর কাছেই তাহারা তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতে কাতরভাবে প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মচারিজীও বিনা দ্বিধায় তাহাদের কুটিরের মধ্যে ঢুকিতে দিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাঘ চলিয়া গেলে দস্যুরা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। এই সকল দৈব ঘটনার মূলে কি ছিল, দস্যুরা তাহা বুঝিল না। যেভাবেই হউক ব্রহ্মচারিজীকে সরাইতে হইবে। কাজেই তাহাদের চেষ্টারও বিরাম নাই।

অন্য এক দিন এক দস্যু ব্রহ্মচারিজীর মস্তক ছেদন করিবার মানসে গভীর রাত্রে তরবারি হস্তে এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কখন ব্রহ্মচারিজী কুটীরের বাহিরে আসিবেন সেজন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় তিনটায় ব্রহ্মচারিজী শৌচ করিবার জন্য কুটীরের বাহির হইলেন। দস্যু ভাবিলেন এই ত সুযোগ। যেমনি বৃক্ষ হইতে নামিতে যাইবে এমন সময় মস্ত লম্বা একটি বিষধর সর্প তাহার সর্ব্বাঙ্গ বৃক্ষের শাখার সহিত জড়াইয়া তাহার মুখের সম্মুখে ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল—দংশন করে আর কি। ব্রহ্মচারিজী কিয়দ্দূরেই শৌচে বসিয়াছেন। সর্পের বন্ধনের যাতনায় এবং দংশনের ভয়ে ভীত,

হইয়া দস্যুটি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারিজী সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া শৌচান্তে সেই বৃক্ষের তলদেশে আসিয়া উপর দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ কারতে লাগিলেন। এই অবস্থায় হঠাৎ সর্পটি দস্যুকে বন্ধনমুক্ত করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। দস্যু আশ্চর্য্য হইল। বৃক্ষের নিম্নে ব্রহ্মচারিজীকে দেখিয়া ইহা তাঁহারই কৃপায় সম্ভব হইয়াছে মনে করিয়া, বৃক্ষ হইতে নামিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল। এবং অকপটে তাঁহার উদ্দেশ্যের কথা ব্রহ্মচারিজীকে বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। ব্রহ্মচারিজী আর কি বলিবেন! ব্রহ্মচারিজীর ন্যায় সাধু পুরুষ কাউকে হিংসা করিতে পারেন না—কাজেই দস্যু নিশ্চিন্ত হইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

বার বার এইরূপ ব্যর্থ হওয়ায় দস্যুসর্দ্দার ভাবিল ইহা তাহার সঙ্গীদের দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাধুর অলৌকিক শক্তির মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়াই তাহারা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া নিজেই কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য দস্যুসর্দ্দার লঙ্কর সিং একদিন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে কুটীরের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচারিজীকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য আদেশ করিল। "বীতরাগভয়ক্রোধঃ," ব্রহ্মচারিজী দ্বারোদঘাটন করিবামাত্র দস্যুসর্দ্দার কয়েক জন সশস্ত্র সঙ্গীসহ কুটীরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মচারিজীকে নানারূপ ভয় দেখাইয়া তখনই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিল। ব্রহ্মচারিজী এতটুকু ভীত হইলেন না, অধিকন্তু শান্তভাবে—গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"ভগবানের নির্দ্দেশে আমি এখানে ভজনে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার সঙ্গে কারোর কোন স্বার্থের সম্বন্ধ নাই,—আমার দ্বারা কারোর কোন অনিষ্ট হবারও আশঙ্কা নাই। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও, আমাকেও আমার কাজ করতে দাও—আমি নিশ্চিন্ত মনে সাধন ভজন করতে থাকি।" তারপর আরো তেজের সহিত বলিলেন, "মনে রাখিও আমিও নিরস্ত্র নহি। এই দেখ ইহার দ্বারা তোমাদের মত শত সহস্রকে এক মুহূর্ত্তে যমালয়ে পাঠাতে পারি। আমাকে স্পর্শ করে কার সাধ্য।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারিজী তাঁহার ঝুলি হইতে একটি থার্ম্মোমিটার বাহির করিয়া সেই দস্যু-সর্দ্দারের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবা মাত্র এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দস্যুরা সভয়ে দেখিল একটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তাহাদের চোখ মুখ ঝলসাইয়া দিতেছে—যেন পুড়াইয়া মারিবে। সর্দ্দারজী উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহার সেই বিরাট লাঠিটা ব্রহ্মচারিজীর পদপ্রান্তে রাখিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং জোড়হাতে বলিল, "মহারাজ! হমলোগোঁ পর কৃপা রখিয়ে। আপ খুসীসে তপ কিজিয়ে, অব কোই আপকো নহি সাঁতা-ওয়েগা। হম্ আপকা দাসানুদাস রহকর আপকো খিজমৎমে রহেঙ্গে। হামারা কসুর মাপ করে।" ইহার পর যতদিন ব্রহ্মচারিজী ঐ পাহাড়ে ছিলেন ততদিন দস্যুসর্দ্দার তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে" ?

——:০:——

মৃতে জীবন দান

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর তিরোধানের পর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে কঠোর সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন। এইভাবে কয়েক বৎসর তিনি ঐ পাহাড়ে বাস করিয়াছিলেন। বৎসরে একবার মাত্র শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর উৎসবে যোগ দিবার জন্য তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া পুরীর আশ্রমে যাইতেন। সেই সময় পথিমধ্যে কোন কোন গুরু ভাইভগ্নীর বিশেষ অনুরোধে দুই এক স্থানে যাইয়া দু'চার দিন করিয়া বসবাস করিতেন।

১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গুরুভগ্নী নিরুপমা দেবীর কাতর প্রার্থনায় ব্রহ্মচারিজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের মানসে পুরীর পথে চন্দননগর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থ-বাড়ীতে থাকা অসুবিধা মনে করিয়া বাড়ীরই নিকটে এক বেলগাছ তলায় আসন স্থাপন করিলেন। ধুনি জ্বালাইয়া নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় সব সময় মগ্ন থাকিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। জনসাধারণের চলার বড় রাস্তাটি অল্প কয়েক গজ দূর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। একদিন একটি মরা নিয়া কয়েক জন হিন্দুস্থানী "রাম নাম সত্য হ্যায়," বলিতে বলিতে ঐ রাস্তা

দিয়া যাইতেছিল, তাহাদের পিছনে পিছনে এক শোকাকুলা রমণী আলুথালু বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। রাস্তার পার্শ্বেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় এক সাধুকে দেখিয়া রমণীটি দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। শোকে দুঃখে এমনই মুহ্যমান হইয়াছিল যে রমণীটি কিছুই বলিতে পারিল না। ধুনির পাশেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ব্রহ্মচারী মহারাজ নিজের কমণ্ডুলুর জল অচৈতন্য রমণীর মুখে চোখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রমণীর জ্ঞান হইল, উঠিয়া বসিয়া ব্রহ্মচারিজীর পায়ে পড়িয়া এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, "এই সংসারে স্বামী ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আমার স্বামীকে তাঁহার এক শত্রু বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে জীবন দান করুন। আমাকে এই বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করুন। আপনি ইচ্ছা করিলেই আমার মৃত স্বামীকে বাঁচাইতে পারেন; অতএব আমার প্রতি কৃপা করুন।" রমণীর এই সব কাতরোক্তি শুনিয়া ব্রহ্মচারিজী বলিলেন, "মা, তুমি ভুল বুঝিয়াছ, তোমার মৃত স্বামীকে বাঁচাইতে পারি এমন কোন শক্তি আমার নাই, তোমার লোকজন আগাইয়া গিয়াছে, শেষে তুমি তাহাদের ধরিতে পারিবে না, তাড়াতাড়ি তুমি তাহাদের অনুসরণ কর।" কিন্তু রমণীটি তাঁহার এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং স্বামীর প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল। রমণীর এই কাতরোক্তি শ্রবণে এবং তাহার শোকাকুল অবস্থা দর্শনে ব্রহ্মচারিজীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি বলিলেন,

"মা, আমি সত্যই বলিতেছি, তোমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দিতে পারি এমন কোন আধ্যাত্মিক শক্তি আমার নাই, তুমি বিশ্বাস কর।" কিন্তু রমণী কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িল না। অবশেষে ব্রহ্মচারীজি বলিলেন, "মা, আমি সত্যই বলিতেছি আমার কোন শক্তি নাই, তবে ভগবানের ইচ্ছায় সবই হইতে পারে। আমি এই ধুনির বিভূতি দিতেছি, ভগবানকে মনে মনে স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া এই বিভূতি তোমার মৃত স্বামীর মুখে ও গায়ে ছড়াইয়া দাও, তাহাতে কাজ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিও শুধু তোমার ভক্তি, বিশ্বাস ও সতীত্ব প্রভাবেই কাজ হওয়া সম্ভব। আরো একটা কথা বলিয়া দিতেছি,—আমার কথা কাউকে বলিবে না, তাহা হইলে কিন্তু তোমার স্বামী বাঁচিলেও পুনরায় মরিয়া যাইতে পারে।" স্ত্রীলোকটি বিভূতি লইয়া বাহির হইয়া গেল। শববহনকারীরা এবং শ্মশানযাত্রীরা বিশ্রাম করিবার জন্য একটি গাছতলায় শব নামাইয়া বসিয়াছিল এবং স্ত্রীলোকটির জন্যও অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় স্ত্রীলোকটি ছুটিতে ছুটিতে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ব্রহ্মচারিজীর দেওয়া বিভূতি মৃত স্বামীর মুখে ও গায়ে ছড়াইয়া দিল। কি আশ্চর্য্য! কিছু সময় পরেই মনে হইল মৃতদেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হইতেছে, ক্রমশঃ শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিল, আরো কিছু সময় অতীত হইলে লোকটি খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিল। সবাই এই কাণ্ড দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, মরাটাকে ভূতে পাইয়াছে, কিন্তু যখন দেখিল মৃত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে

কথা বলিতেছে এবং তাহার পূর্ব্বস্মৃতি সবই ফিরিয়া আসিয়াছে তখন তাহাদের ভূতের ভয় দূর হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকলে স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া বসিল। সঙ্গীদের একজন পথের পাশে সাধুজীকে দেখিয়াছিল এবং স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার পদতলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেও দেখিয়াছিল, এই কথা সকলকে বলায় তাহাদের আর সন্দেহ রহিল না যে ঐ সাধুর কৃপাতেই মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সকলে সাধুজীর কাছে রওয়ানা হইল। ব্রহ্মচারিজীর মনে হইল মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাওয়ামাত্র তাহার সহযাত্রীরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে—এবং এই কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে তাঁহার আর উপায় থাকিবে না—লোকের যন্ত্রণায় তাঁহাকে অস্থির হইতে হইবে। তাই তিনি আর দেরী না করিয়া তখনই ঝোলাঝুলি কাঁধে তুলিয়া গুরুভগ্নীটির বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তখনই ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া দেখেন কলিকাতা যাওয়ার গাড়ী প্রস্তুত। তিনি উঠিয়া বসিলেন। ওদিকে মৃতের সহযাত্রীরা সাধুর খোঁজে বেলতলায় আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু সাধু কোথায়! বেলতলা শূন্য। সাধুজী কোথায় উধাও হইয়াছেন। কি আর করিবে, তাহারা নিরাশ হইয়া যে যার পথে ফিরিয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর ব্রহ্মচারিজীর শিষ্য নলিনাক্ষ তা প্রভৃতির চেষ্টায় চন্দননগরে ঐ বেলতলা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানটি আশ্রম করিবার জন্য কেনা হয়। ব্রহ্মচারিজী মহারাজ

ঐ স্থানে আশ্রম করিয়া একটি পঞ্চবটি স্থাপন করেন এবং মন্দিরে শ্রীশ্রীগোস্বামীজির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মচারিজী ১৩১৮ সালে মহাষ্টমী তিথিতে ঐ স্থানে এক মহাহোমের প্রবর্ত্তন করেন। সমগ্র চণ্ডী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া বিল্বপত্র ও ঘৃতের দ্বারা ব্রহ্মচারিজী শিষ্যসহ অগ্নিতে আহুতি প্রদানে এক বিরাট সপ্তশতী মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তাঁহার এই কার্য্যে শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ, কাঠিয়াবাবা, গম্ভীরনাথজী প্রভৃতি বহু মহাপুরুষের অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ তিনি লাভ করেন।

——:o:——

অপূর্ব্ব খেলা

১৩৩৪ সাল, গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে আমি ও 'টেলিগ্রাফিষ্ট' বিনয় গাঙ্গুলী কটক হইতে পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

সারা বৎসরের মধ্যে এই একটি মাত্র দিন শ্রীগুরুকে ফুল চন্দন দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পূজা করিবার সুযোগ শিষ্যেরা পায়—কিন্তু শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজী অসুস্থ—সকলের প্রাণ সশঙ্কিত। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এবার পূজাধিকারে আমরা বঞ্চিত হইলাম। সকলকে জলযোগ করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। আমি অতি প্রত্যূষে নানা জাতীয় সুগন্ধ ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছি, পূজার অন্যান্য উপকরণ সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়া সুযোগের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সময় কাটাইতেছি। বিরূপ আদেশ শুনিয়া প্রাণে গভীর ব্যথা পাইলাম। প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সারা দিন নিরম্বু উপবাসে থাকিবার সঙ্কল্প লইয়া ছাদের উপর একটি নির্জ্জন ঘরে আসন করিয়া চোখের জলে শ্রীনামে সমাহিত হইতে সচেষ্ট হইলাম। বেলা ১১টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বলিলেন,—আমার শরীর বড় অসুস্থ যদি এখনও কেহ জলটল না খাইয়া

থাকে তবে এই সময় পূজা করিয়া খাইয়া নিক।" সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন কারণ তখন সকলেই বাল্যভোগ ও চাভোগ প্রসাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আমার খোঁজ পড়িল। আমি অন্তর্যামী শ্রীভগবানের অপার করুণায় অভিভূত হইয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া পূজা করিয়া ধন্য হইলাম।

বিকাল বেলায় ছাদের উপর ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন। একজন গুরুভ্রাতা জীবন্মুক্তের লক্ষণাদি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছিলেন; তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন—"মানুষ মরিয়া গেলে যেমন তাহার দেহে দুঃখের অনুভব হয় না সেই রকম প্রাণযুক্ত অবস্থাতেও যখন শরীরে সুখ দুঃখ অনুভব হইবে না তখন সাধক কৈবল্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলা যায়"—

গতে প্রাণে যথা দেহ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ ॥

ইত্যবসরে বিনয়বাবু তাঁর স্ত্রীবিয়োগজনিত ব্যথা বা সাংসারিক নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর নানা উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'অবশ্যম্ভাবী যে ভোগ, তার প্রতিকার যদি সম্ভব হইত তবে নলরাজা, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কখনও দুঃখে পড়িতেন না'—

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্ যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ ॥

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইতে চলিল। ঠাকুরের আত্মগোপনই

একটা মস্ত অলৌকিক ব্যাপার। এতদিন কেহ কখনও সাক্ষাৎভাবে পূজারতি করিতে সাহস পায় নাই। সমস্ত দায়িত্ব আমি স্কন্ধে লইব প্রতিশ্রুতি দিয়া আমরা কয়েকজন পঞ্চোপচারে আরতি করিবার সঙ্কল্প করিলাম এবং গুরুভ্রাতা বসন্ত ভট্টাচার্য্যকে দিয়া সমস্ত আয়োজন ঠিক রাখা হইল। ঠাকুর যেমন ছাদের উপর নিজ আসনে আসিয়া বসিলেন অমনি আরতি আরম্ভ হইল এবং ঘড়ি, ঘণ্টা, কাঁসর, খোল, করতাল বাজিয়া উঠিল; শ্রীগুরু যোড়করে নতশিরে নিষ্কম্প প্রদীপবৎ বসিয়া রহিলেন। একটা দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, সকলে বিস্ময়ে ও পুলকে অভিভূত হইল। উপরে পূর্ণিমার চাঁদ সুধাবর্ষণ করিতেছিলেন। গুরুভগ্নীরা এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সানন্দে সোৎসাহে উলুধ্বনি করিয়া দিগন্ত প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। পরে আমরা অনেকে সুগন্ধ পুষ্পমাল্যে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিয়া সাশ্রুনয়নে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম।

ইতিমধ্যে ৺জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে মহাপ্রসাদ আসিয়া পড়িল এবং ঠাকুরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া একদিকে গুরুভাইরা ও অন্যদিকে গুরুভগ্নীরা প্রসাদ পাওয়ার জন্য বসিয়া পড়িলেন। উচ্চৈঃস্বরে নানা মহাজন-পদাবলী ও শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে সকলে মহানন্দে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। এদিকে ভীষণ ঘনঘটা করিয়া কৃষ্ণমেঘে আকাশ আচ্ছাদিত হইল, পূর্ণিমা নিশি অমাবস্যায় পরিণত হইল। আষাঢ় মাস, বৃষ্টি প্রায় পড়ে পড়ে, সকলেই শঙ্কিত। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে

শীঘ্র আহার সমাপন করিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং নিজের বাম হাতখানি নিজ মস্তকোপরি আবরণ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। ছাদের সকল ধারে প্রবল বৃষ্টি পড়িতেছে অথচ আমরা সকলে যেখানে প্রসাদ পাইতেছি সেখানে এক ফোঁটাও বৃষ্টি নাই, এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে আমরা সকলে পুলক বিস্ময়ে অভিভূত ও নির্ব্বাক নিস্পন্দ রহিলাম। আমাদেরও আহার সম্পূর্ণ হইল এবং যেমন ঠাকুর আঁচাইয়া তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিলেন; অমনি অঝোরে বৃষ্টিপাত হইয়া সারা ছাদ প্লাবিত হইয়া গেল।

---:o:---

বিদেশীর সঙ্গে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ

ইংরাজী শিক্ষায় তেমন পারদর্শী না হইলেও ব্রহ্মচারিজী যে কোন লোকের সঙ্গে মিশিতে ও কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেন ; দোভাষী কেউ কেউ সাহায্য করিলেও বেশ দেখা যাইত যে তিনি সকলের সব ভাষাই যেন জানেন।

ডাঃ ইভ্যানস ওয়েলজ নামক এক জন আমেরিকান পুরী ও কনরকের মাঝামাঝি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে সমুদ্রের ধারে একটি প্রকাণ্ড বাগান ও আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। তিনি ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করিতেন। তিব্বতে দশ বৎসর কাল বাস করিয়া তিনি তাহাদের সাধনপ্রণালী ও ভাষা সম্বন্ধে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন ; তিনি মাঝে মাঝে ব্রহ্মচারিজীর সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতে আসিতেন এবং খুবই গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন। নিজে আমেরিকা চলিয়া যাওয়ার সময় ব্রহ্মচারিজীকে নিজ আশ্রমটি লিখিয়া দিতে চান কিন্তু ব্রহ্মচারিজী তাহা লইতে অস্বীকার করেন। "ভারতীয় ও তিব্বতীয় সাধুগণের ইতিবৃত্ত" নামক তাঁর বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকে তিনি শ্রীশ্রীকুলদানন্দজীর প্রতিকৃতিসহ তাঁহার জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে শিষ্য একান্তভাবে গুরুতে

আত্মসমর্পণ করিলে গুরু কৃপা করিয়া সমস্ত বিদ্যা শিষ্যে সঞ্চার করিয়া যান। শিষ্যকে আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; শ্রীগুরু নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিতে ও স্নেহভালবাসায় শিষ্যকে অনুগত করিয়া লন।" ব্রহ্মচারিজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য ও গোস্বামী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণজীর জীবন-কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া তিনি ভারতীয় সাধনে অনুরাগী হইয়াছিলেন।

একটি ইউরোপীয় দম্পতি (ভন-ডি-গ্রাফ ও তাঁর পত্নী) চিনির ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা-দেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন। একবার কলিকাতায় গ্রাণ্ড হোটেলে বাসকালে তাঁহারা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে দাস ষ্টুডিও দোকানে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর বড় একটি ফটো দেখিয়া অবাক্ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মেম সাহেব বলিলেন যে যবদ্বীপে থাকাকালীন তাঁহার একটি কন্যা মারা যায় এবং এই সাধু প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সান্ত্বনা দেন। পরে সমস্ত পরিচয় লইয়া তাঁহারা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন মহাশয়ের বাটিতে ব্রহ্মচারিজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া উপযুক্ত সাধন ভজন দ্বারা জীবন গঠন করিয়া ধন্য হন। মেমসাহেব আজীবন নিরামিষাশী ও স্বল্পভোজী ছিলেন। দূর-দর্শন ও দূর-শ্রবণ প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবে তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল; শোনা যায়, মেম সাহেব আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া গুরুপদে লীন হন এবং সাহেবটি হিমালয়ে গোপন সাধন ভজনে ব্রতী আছেন।

রেভারেণ্ড মৌলমিন নামে চিকাগোর একজন বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটি বাণীর জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, "আপনারা যেভাবে ভারতের পরিচয় নিতে আসেন তাতে এ দেশকে চেনা যায় না। ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা। কাজেই ভারতকে জানতে হলে এই আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়েই জানতে হবে। সেজন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির সংস্রবে আসা চাই। তাঁদের নির্দ্দেশিত পন্থায় চ'লে, ঋষি-পন্থা অনুসরণ করলেই ভারত সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা। শুধু বাইরের দৃষ্টিতে বিচার আর বিশ্লেষণে ভারতকে জানা যায় না—যাবে না।"

তৎপর তাঁহারই সঙ্গী একজন প্রশ্ন করিলেন "আপনারা বিদেশে গিয়ে আপনাদের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন না কেন?" শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসিলেন;—বড় মধুর সে হাসি; তারপর বলিলেন, "পথের পার্শ্বে একটি মুমূর্ষুকে দেখে এক পথিক ভাবলেন, একে তুলে একটু ভাল স্থানে রেখে আসি, অন্য জন ভাবলে, বিছানা বস্ত্র যোগাড় করে দি, তারপর এক চিকিৎসক দেখতে পেয়ে তাকে পরীক্ষা করে ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই সময় এক সাধু ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, মুমূর্ষুকে দেখে ভাবলেন, এর ত শেষ সময় উপস্থিত, একটু ভগবানের নাম শোনাই, পরকালের কল্যাণ হবে। এমনি করে যার যেরূপ স্বভাব ও সংস্কার সে তদনুরূপ ব্যবস্থাই করতে চাহিলেন এবং করলেন। ভারতীয় সাধুরাও

তদ্রূপ তাঁদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে তাঁদের রীতি অনুযায়ী জগৎকল্যাণ করে থাকেন। সেজন্য তাঁদের বিদেশে ছুটতে হয় না, বক্তৃতা দিতে হয় না, প্রবন্ধ লিখে, বই প্রকাশ করে প্রচারও করতে হয় না। স্বীয় আসনে বসেই এমন সব কাজ করে যান, যার শক্তি সমস্ত বিশ্ববাসীরই কল্যাণ সাধন করে। স্থূল দৃষ্টিতে তা' দেখা যায় না বটে কিন্তু সে শক্তি অমোঘ—অনন্তকাল ধরে সেই শক্তি কার্য্য করে থাকে।"

——:০:——

এত নুন গেল কোথায় ?

চন্দননগরের ঠাকুর বাড়ীতে সহস্রাধিক ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। মহাষ্টমী তিথিতে সপ্তশতী মহাহোম উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে খিচুরী ও লাফ্‌রা ভোগ হইবে। রসুই হইতেছে—একাধিক ব্রাহ্মণ রসুই করিতেছেন। একজন রসুইয়া এক কড়া লাফ্‌রাতে উপযুক্ত পরিমাণ নুন দিয়া শৌচে চলিয়া যান। অন্য একজন রসুইয়া ঐ কড়াতে নুন দেওয়া হয় নাই মনে করিয়া পুনরায় নুন দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকেন। শৌচান্তে প্রথম রসুইয়াটি ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে পায় লাফ্‌রাতে আবার পরিমাণ মতন নুন দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া ত তাঁহার চক্ষু স্থির। এই লাফ্‌রা নুনে পুড়িয়া অখাদ্য হইবে মনে করিয়া তাঁহার অনুশোচনার অন্ত রহিল না। ভোগ নষ্ট হইল ভাবিয়া তিনি হায়! হায়! করিতে লাগিলেন এবং দুঃখে কষ্টে কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দ্বিতলে অবস্থান করিতেছিলেন। আমাদের জনৈকা গুরুভগিনী যাইয়া তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "গোসাঁইজীকে ভোগ দেওয়া হইলে সে সব বস্তু অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদে পরিণত হয়; তখন কি আর তার স্বাদ খারাপ হইতে পারে? সে তো অমৃতের ন্যায় স্বাদু হইয়া যাইবে, কাজেই এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিও না।" কিন্তু

গুরুভগিনীটি ঐ কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না, নানারূপ যুক্তিতর্কের দ্বারা মনের উদ্বেগ ও অশান্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন উপস্থিত সমস্ত শিষ্য শিষ্যাদের ডাকিয়া বলিলেন, "যাও, প্রত্যেকেই আন্দাজ মতন নুন লাফ্‌রাতে দিয়া আস।" তাঁহার আদেশ পালিত হইল। প্রায় দুই শত ভক্ত নুন দিলেন। সবাই কিন্তু ভয়ে শঙ্কিত, ভাবিতেছে, লাফ্‌রা নুনে পুড়িয়া অখাদ্য হইয়া গিয়াছে! যাহা হউক, যথাসময়ে ভোগ নিবেদন করা হইল। প্রসাদ পাইতে বসিয়া সকলেরই চোখে জল, মুখে হাসি—সেই লাফ্‌রার কি অপূর্ব্ব সুগন্ধ—এমন স্বাদু লাফ্‌রা জীবনে কেহ কখনো খায় নাই। মনে প্রশ্ন জাগে, 'এত নুন গেল কোথায়?'

——:০:——

তপঃপ্রভাব

চাকুরী উপলক্ষে কটকে আছি। যে কোন সুযোগে পুরী আশ্রমে গিয়া গুরুমহারাজের (শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীর) সঙ্গ করিয়া থাকি। ১৩৩৪ সালের পৌষ বা মাঘ মাসে এক রবিবার সকালের গাড়ীতে আশ্রমে পৌঁছিলাম। সঙ্গে তেমন শীত বস্ত্র বা বিছানা লইয়া যাই নাই কারণ সেই রাত্রিতেই ফিরিতে হইবে। তুপুর বেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল এবং সামাজিক জীবন কেমন কলুষিত হইয়া গিয়াছে, কল্যাণকর কোন কাজ করিতে গেলেও কিরূপ বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় ইত্যাদি বলিতেছি, এমন সময় ঠাকুর একটি শ্লোকের অর্থ যাহা বলিলেন তাহা এই :—গুণীলোকের এমন কি গুণ থাকিতে পারে যাহাকে তুর্জ্জনেরা দোষকলঙ্কিত না করে? তুমি লজ্জাশীল হইলে তাহারা বলিবে তুমি জড় বুদ্ধি, নিয়মনিষ্ঠ হইলে দাম্ভিক বলিবে, শুদ্ধাচারী হইলে বলিবে কপট, বীর্য্যবান হইলে বলিবে নিষ্ঠুর, সরল প্রকৃতি হইলে বলিবে বোকা, প্রিয়ভাষী হইলে বলিবে তেজোহীন, তেজস্বী হইলে বলিবে উদ্ধত, বাগ্মী হইলে বলিবে বাচাল এবং ধীর বুদ্ধি হইলে বলিবে শক্তিহীন।—

"জাড্যং হ্রীমতি গণ্যতে ব্রতরুচৌ দম্ভঃ শুচৌ কৈতবং
শূরে নির্ঘৃণতা মুনৌ বিমতিতা দৈন্যং প্রিয়ালাপিনি।

তেজস্বিন্যবলিপ্ততা মুখরতা বক্তর্য্যশক্তিঃ স্থিরে
তৎ কো নাম গুণো ভবেৎ সুগুণিনাং যো দুর্জনৈর্নাঙ্কিতঃ ॥”

অন্য এক গুরুভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন,—তোমাকে বলেছিলাম স্ত্রীকে ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়াবার জন্য কিন্তু তুমি তা না করে বহু টাকা চিকিৎসায় ব্যয় করে শেষে তাকে মারবার জন্য এখানে এনেছো, তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধি দেখে ব্যথা পাই।” গুরুভ্রাতাটি বলিলেন—“গলায় পৈতে থাকলেই ত আর ব্রাহ্মণ হয় না। আমার কারও প্রতি বিশ্বাস নাই। বড় বড় ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছেন কাজেই স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা, আপনাকে দর্শন করাতে এনেছি।”

রাস্তা দিয়া একটি উড়িয়া ব্রাহ্মণ যাইতেছিল। দুই পায়ে গোদ—ধূলিধুসরিত নোংরা পা। ঠাকুর আশ্রমস্থ একজনকে বলিলেন, ঐ ব্রাহ্মণের পাদোদক লইয়া আসিতে। গুরুভ্রাতাটি ঘৃণায় নাক সিঁটকাইলেন কিন্তু পাদোদক আনা হইলে তাহা সেই গুরুভগ্নীটিকে খাওয়ান হইল। ঠাকুরের নির্দ্দেশ ও প্রাণের দায়ে শ্রীমতী অতি ভক্তিভরে চরণামৃত খাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে গুরুভগ্নী অচিরে রোগমুক্ত হইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং গুরুভ্রাতাটির পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে রাত্রিতে আশ্রমে কাটাইতে আদেশ করিলেন। আমিও সমস্ত রাত্রি ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় সাধনভজনে কাটাইবার সঙ্কল্প করিলাম কারণ উপযুক্ত শীতবস্ত্র বা বিছানা না থাকায় এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি

ব্যবহার নিষেধ বিধায় রাত্রে স্বাভাবিকভাবে শীতের প্রকোপে নিদ্রা না হওয়ারই আশঙ্কা সমধিক ছিল। রাত্রি ১০৷৷০ টার সময় আমি আসনে বসিয়া অনুভব কারতে লাগিলাম যে আমি যেন কোন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে সুকোমল শয্যায় শায়িত আছি এবং পরম সুখে নামানন্দে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

প্রত্যূষে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে গিয়াছি, শ্রীগুরুদেব সস্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—'শীতে কষ্ট হয় নাই ত?' তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে চোখের জলে শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইলাম।

——:০:——

গুরুকৃপা

শাস্ত্র বলেন,—

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দেবানুগ্রহসূচকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥

—মনুষ্যত্ব মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের আশ্রয় বড়ই দুর্লভ ; একমাত্র দৈবানুগ্রহেই এই তিনটি লাভ হইয়া থাকে। আমরা যে শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীর ন্যায় মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি তাহা দৈবানুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নহে। দৈবানুগ্রহে তাঁহার সেবা করিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম তখন তাঁহার আত্মগোপন করিবার যে প্রচেষ্টা দেখিয়াছি,—তাহারই একটি অপূর্ব্ব কাহিনী আজ সুদর্শনের পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিতেছি।

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদের সতীর্থ। মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। তিনি বরিশাল খয়রাবাদে একটি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করিতেন—পত্রিকাটির নাম "পথিক" তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনা এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং পত্রিকাটি ব্রহ্মচারিজীর কাছে পাঠাইয়া দেন। ঘটনাটি এই :—অতীনবাবু একবার ভীষণ রোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তারগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আশা ছাড়িয়া

দিলেন। রোগী মুমূর্ষু—কখন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এমনি অবস্থায়, একদিন রাত্রে অতীনবাবু দেখিলেন, শ্রীগুরু তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কমণ্ডলুর জল তাঁহার গায়ে ছিটাইয়া দিতেছেন; তারপর তাঁহাকে হাত তুলিয়া অভয় দিয়া অন্তর্হিত হন। আশ্চর্য্য! তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রনা ঘুচিয়া গেল—রোগ সারিয়া গেল। অদ্ভুত—অলৌকিক ব্যাপার। অতীনবাবু শ্রীগুরুদেবের এই অপার করুণা ও অদ্ভুত কার্য্যাবলীর কথা চিন্তা করিতে করিতে ভাববিহ্বল হইলেন এবং চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিতে লাগিল। গভীর রাত্রে ডাক্তার আসিয়া রোগীর মশারী তুলিলেন। তাঁহার ধারণা ইতিমধ্যে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার মশারী তুলিয়া দেখিলেন রোগী সুস্থ—বসিয়া আছে। ডাক্তার এই দৃশ্য দেখিয়া শুধু আশ্চর্য্য হইলেন না—হতবাক্। যাহার মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চয় ছিলেন এবং অবধারিত সত্য বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, সেই রোগীকে সুস্থ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিলে মনের কি অবস্থা হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিস্ময়াভিভূত ডাক্তারবাবু নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি বলুন ত! আপনি সুস্থ হইয়াছেন,—এযে কল্পনাতীত ব্যাপার! ডাক্তারী বিজ্ঞানকে আপনি হার মানাইয়াছেন। আপনি ভূত নন ত?" ইতিমধ্যে আরো কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অতীন বাবু ভাববিহ্বলচিত্তে শ্রীগুরুকৃপার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। সকলেই

শুনিল—শুনিয়া মুগ্ধ হইল—অবনত মস্তকে সদ্‌গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

কিছুদিন পর জটিয়াবাবার উৎসব। অতীনবাবু উৎসব উপলক্ষে পুরী গিয়াছেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর সকল শিষ্য-শিষ্যাদের সমবেত করিয়া অতীনবাবুকে ঐ ঘটনা বর্ণনা করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশে অতীনবাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। সকলেই বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে ঘটনা শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুর অপার মহিমার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "অতীন! তোমার ধৃষ্টতা ত বড় কম নয়। তুমি আমাকে প্রচার করতে যাও কোন সাহসে? তোমার এই ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছি। তুমি আমাকে কতটুকু জেনেছ বা বুঝেছ যে প্রচার করতে যাচ্ছ? গুরুর মহিমা বুঝতে হলে পাহাড় পর্ব্বতের নির্জ্জন প্রদেশে অন্ততঃ ২০ বৎসর সাধন-ভজন করে এসো। গুরুর মহিমা এভাবে প্রচারের বিষয় নহে—যদি কিছু উপলব্ধি হয় তবে তাহা গোপনীয়—সর্ব্বদা গোপন রাখতে হয়। তোমাদের সকলকেই আমি এ বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি। প্রচারের ভাব থাকলে আত্মোন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে সর্ব্বনাশ হবে। সর্ব্বদা মনে রাখবে—"প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা।"

আত্মগোপন-লীলা

বর্ত্তমান যুগে খাঁটি জিনিষ পাওয়া দুর্ল্লভ। 'কফভরা রুমালের মত, বাইরে একটু আতরমাখা' সভ্যতারই চাকচিক্য সর্ব্বত্র। নিজেকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জাহির করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুর আদেশ ও উপদেশকে উপেক্ষা করিয়া নানা রং'এ কাপড় ছোপাইয়া, তিলকমালাজটায় সজ্জিত হইয়া সাধু ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া, শাস্ত্রের কতকগুলি মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া, ভগবন্নাম প্রসঙ্গে প্রেমিকজনসুলভ অষ্ট সাত্ত্বিকভাব বিকারের অভিনয় দেখাইয়া, লোকসমাজে বাহবা অর্জ্জনের ও লোকসংগ্রহের প্রচেষ্টায় সবাই মত্ত। এই সব বাহ্যিক আচরণের দ্বারা কতক সময়ের জন্য কতকগুলি সরল ও তরলমতি লোককে প্রতারিত করা সহজ হইলেও শ্রীভগবানের প্রিয় হওয়া সম্ভবপর নয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় জনের গুণাবলী সম্বন্ধে—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং······ অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ," যাহা বলিয়াছেন সেই সব লক্ষণগুলি আত্মজীবনে ফুটাইয়া না তুলিতে পারিলে প্রকৃত কল্যাণ নাই।

ইহারই পার্শ্বে অন্ধকারে আলোর ন্যায় দু'একজন এমন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি থাকেন যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্ষমতা হস্তে রাখিয়াও নিজেকে প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া রাখেন এবং প্রকৃত

অধিকারী না হইলে কেহই তাঁহাকে জানিতে বুঝিতে পারে না।

গত তিন বৎসর ধরিয়া আমরা সুদর্শনের পাঠকগণকে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর জীবনের যে সকল ঘটনা বলিয়াছি তাহা হইতে তাঁহারা অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন যে তিনি ছিলেন গীতোক্ত উক্ত গুণাবলীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। ইহার পর তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব 'আত্মগোপন' সম্বন্ধে কিছু বলিব—

মহাত্মা গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য মহাদেব দেশাইজী কোন বাঙ্গালী সহকর্ম্মীর (কৃষ্ণদাসজী) মাধ্যমে ব্রহ্মচারীজীর পাঁচ খণ্ড ডায়েরী 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া পরম আগ্রহ-সহকারে তাহা পড়াইয়া শুনিতেন এবং বিশেষ বিশেষ অংশ অনুবাদ করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও স্ত্রীর নিকট পত্রদ্বারা প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে প্রেরণা জোগাইতেন। নিজেদের আশ্রমাদিতে বিশেষ উপদেশ ছাপাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। ক্রমশঃ মহাত্মাজীও 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহা নিজ দেশের জনসাধারণের কল্যাণ কামনায় গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে মহাত্মাজী যখন কলিকাতায় আসেন ব্রহ্মচারিজীর সহিত সাক্ষাৎভাবে ঐ প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার মানসে, স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য তাঁহার কোন বিশ্বস্ত অনুচরকে ব্রহ্মচারিজীর সকাশে পাঠাইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারিজী সমস্ত শুনিয়া যোড়হস্তে বিনয়নম্র বচনে বলিলেন,—'গান্ধীমহারাজকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন

যে পাঁচজন লোক পথ চলতে চলতে পথের পাশে যদি কোন একটি লোককে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তবে সকলেই দয়ার্দ্র চিত্তে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। একজন শীত গ্রীষ্মে তাকে এই রকম ফাঁকা জায়গায় পড়ে থাকতে দেখে উপযুক্ত আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দেয়, অন্যে তাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখে আহারের ব্যবস্থা করে, অসুস্থ দেখে কেউ বা ঔষধপথ্যের সংস্থান করে, কেউ বা তাকে মুমূর্ষু বুঝে তার আত্মার মঙ্গল কামনায় কানে ভগবানের নাম দেয়। সকলেরই কর্ম্মপ্রেরণা আন্তরিকতা-পূর্ণ ও নিঃস্বার্থ অথচ নিজ নিজ শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কারমত এক এক জন এক একটি বিশেষ কর্ম্মপদ্ধতির প্রাধান্য দেয়। দেশের কল্যাণকল্পে গান্ধীজী যে কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করছেন তাঁর সঙ্গে আমার কর্ম্মের মিল নাই কাজেই আমি চাই না যে তিনি আমার কাছে এসে কৌতূহলী জনসাধারণের চক্ষে আমাকে প্রকাশ করেন। আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি, নির্জ্জনে গোপনে থাকতে চাই; আমার কোন অপরাধ যেন না লয়েন'। নিজের নাম প্রচারের এত বড় সুযোগ তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন, কারণ যথার্থ সাধুর নিকট 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা।' আজ মহাত্মাজী স্থূল দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বহু ভক্ত তাঁহার ইচ্ছাকে কার্য্যকরী করার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন। সদ্‌গুরুসঙ্গের গুজরাটী অনুবাদ করিয়া, কেহ তাঁহার এই ইচ্ছাকে পূরণ করিলে দেশের প্রকৃতই কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

————

অপূর্ব্ব দর্শন

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাশ্চ চত্বার স্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥

"মানব হৃদয়ে ভগবদনুরাগের আভাস মাত্র উদিত হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ তৃণতুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

শ্রীগুরু ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী সর্ব্বদা নামসাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। যোগসিদ্ধি—বিভূতি, অষ্টসিদ্ধি, প্রভৃতির ও দর্শনের কথা বলিতে গেলে তিনি এই সব বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শনে সকলের উৎসাহ দমিত রাখিতেন এবং একমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসে নামের প্রতিই প্রধানতঃ দৃষ্টি দিতে বলিতেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য গোপনে রাখিয়া তিনি সাধারণের অপেক্ষাও সাধারণের মত চলিতেন এবং অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও স্বভাবস্ফূর্ত্ত তাঁহার যে সকল অলৌকিক শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত তাহা বিন্দুমাত্র প্রকাশ বা আলোচনা করিবার উপায় ছিল না, এমনই কঠোর ছিল তাঁর অনুশাসন।

১৩৩৬ সালের ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে আমরা অনেকে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে চন্দননগর ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে সমুপস্থিত। সকাল বেলা ৮টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত

অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া (সঙ্গে ব্যারিষ্টার এ, কে, ঘোষ) আসিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন এবং শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, সারা বিশ্বের সকল সাহিত্যের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই এবং ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া প্রচারের প্রার্থনা জানাইলেন। পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে বৌদ্ধদর্শনের যে সার বস্তু সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে তাহা পড়িয়াই বড়ুয়া সাহেব মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছেন এবং যখন জানিলেন যে ব্রহ্মচারিজী কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ পড়েন নাই তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন। যাঁহাকে জানিলে সকল জানা সার্থক হয়, তাঁহার জীবন্ত বিগ্রহ সম্মুখে দেখিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলেন।

প্রায় ১০টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম প্রাঙ্গণে পঞ্চবটী তলায় যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। চক্ষু দুটি উন্মীলিত অবস্থায় যেন কোন সুদূর অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাঁহাকে উত্তেজিতভাবে নিজের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্তে সজোরে আঘাত করিতে দেখিলাম। আমার ডায়েরীতে সময় ও তারিখ লিখিয়া রাখিলাম। কারণ, ঠাকুরের এই সব কার্য্যকলাপের পশ্চাতে অনেক অলৌকিক ঘটনা নিহিত থাকে যাহা পরে প্রকাশ পায়। তাঁহার চিঠিপত্রাদি লিখিবার ভার তখন এই অধমের উপর থাকায় বহু বিচিত্র ঘটনা জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। চার পাঁচ দিন পর গোপালগঞ্জের সতীর্থ অমৃত বিশ্বাস মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে সেইদিন

ঐ সময় তাঁহাকে কয়েকজন নমঃশূদ্র গুণ্ডা আক্রমণ করে এবং একজন বর্শা দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে অকস্মাৎ এক বিকটদর্শন পুরুষ উপস্থিত হইয়া সকলকে লাঠির আঘাতে ধূলিসাৎ করিয়া অদৃশ্য হয়। অমৃতবাবু কিন্তু ঠাকুরকেই দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

শিবরাত্রিতে সকলকে সারা রাত্রি শ্রীগুরু সমীপে আসনে বসিয়া চার প্রহরে চার বার হোম, পূজা পাঠ, স্তবস্তুতি করিতে হইত। মধ্য রাত্রে আমি এই গানটি গাহিতে লাগিলাম :—

নাচে পাগলা ভোলা বাজে বম্ বম্ বম্।
শিঙ্গা বাজিছে ভোঁ ভোঁ ভম্ ভম্ ভম্॥

* * * *

নাদ উঠিছে সোঽহং সোঽহং।

যেমন 'সোঽহং' কথাটি আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর 'সোঽহং' বলিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত লম্বা জটাগুলি মস্তকোপরি খাড়া হইয়া উঠিল। এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল জ্যোতি সারা অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, সমস্ত শরীরটি তুষারশুভ্র এবং ললাটের উপরে সর্পফণা দোদুল্যমান—সাক্ষাৎ সদ্‌গুরু সদাশিব মহাদেব। উপস্থিত ভাগ্যবান অনেকে সাক্ষাৎভাবে অপ্রাকৃত দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইলেন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে গিয়া কেহ কেহ জ্ঞান

হারাইলেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই শ্রীগুরু ভাব সংবরণ করিয়া লইলেন, মায়া বিস্তার পূর্ব্বক আবার সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং পরে কেহ কেহ এই প্রসঙ্গ তুলিতে গেলে ধমক্ দিয়া নিরস্ত করিলেন এবং 'আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা' বলিয়া সকলকে গোপন রাখিবার আদেশ করিলেন।

অনাসক্তি যোগ

"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নিন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥"

বিষয়াভিনিবেশ ও কৃষ্ণানুরাগ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগের ন্যায় বিপরীতমুখী। যেমন পূর্ব্বাভিমুখে গেলে পশ্চিমদিগের বস্তু পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষয়াভিলাষের গন্ধ থাকিলে কৃষ্ণানুরাগ হয় না।"

সতীর্থ মহানন্দ নন্দী মহাশয় ছিলেন কর্ম্মবীর। মধ্যে মধ্যে নিজ রুচি ও ভাব অনুযায়ী শ্রীগুরুর সেবা করিতে গিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে এবং সেই সব ঘটনায় আমাদের সকলের কত না শিক্ষা লাভ হইয়াছে।

পুরীর ঠাকুরবাড়ী আশ্রমকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিকতার ও ব্যাকুলতার অভাব ছিল না। একবার তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে বিলাত হইতে জাহাজভরা এইবার যে মাল (লোহালক্কর) আসিতেছে তাহার লভ্যাংশ সমস্তই শ্রীগুরুর সেবায় নিয়োগ করিবেন। আড়াই লক্ষ টাকার স্বর্ণমুদ্রা শ্রীগুরু চরণে অর্পণ করিয়া তিনি প্রার্থনা জানাইলেন— 'এক লক্ষ টাকা আশ্রমের প্রয়োজনে রক্ষিত থাক এবং বাকি

দেড় লক্ষ টাকা আপনার ইচ্ছামত টোল, হাসপাতাল বা যা ইচ্ছা তাতে নিয়োগ করতে পারেন।' ঠাকুর বলিলেন—'আমার এখানে যারা প্রকৃত ধর্ম্মলাভের জন্য আসবে তাদের যোগক্ষেম শ্রীভগবানই বহন করবেন, এক মুষ্টি অন্নের অভাব তাদের কখনও হবে না। আমার আকাশবৃত্তি, ভগবানের উপর নির্ভর না করে তোমার টাকার উপর নির্ভর করতে গেলে ব্রতভঙ্গ হবে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হতে হবে। ইচ্ছা হলে লক্ষ লক্ষ টাকা ভূতে দিয়ে যায়। দেশের বহু প্রতিষ্ঠান আছে যাদের এই অর্থের প্রয়োজন, সেখানে এই টাকা দিয়ে দাও।' বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ঠাকুর এই দান গ্রহণ করিলেন না।

আর একবার মহানন্দ দাদা ঠাকুরের চিঠিপত্র, খাতা কলম প্রভৃতি রাখিবার জন্য দামী মখমল দ্বারা একটি সুদৃশ্য পত্রাধার তৈয়ারী করাইয়া তাহাতে নানা রংএর রেশমী সূতাদ্বারা সুনিপুণভাবে ঠাকুরের নাম অঙ্কিত করাইলেন। তাহার ভিতর শ্রীগুরুর নামাঙ্কিত নানাপ্রকারের চিঠির কাগজ, খাম, কার্ড ও নাম মুদ্রিত ঝর্ণা কলম পুরিলেন। ঠাকুরের বিছানা গুটাইয়া বাঁধিবার জন্য মোটা রঙ্গীন পশমী কাপড় দ্বারা একটি চমৎকার 'হোল্ডঅল' তৈয়ারী করাইয়া তাহাতেও বড় বড় অক্ষরে ঠাকুরের নাম লেখাইলেন। নানা রং বেরং-এর রেশমী কাপড় দিয়া সুন্দরভাবে সেলাই করাইয়া একখানি হালকা বালাপোশ তৈয়ারী করাইয়া তাহাতেও শ্রীগুরুর নাম মুদ্রিত করাইলেন। সমস্ত জিনিসগুলি লইয়া তিনি দুপুর বেলা পুরী আশ্রমে পৌঁছিলেন এবং সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরকে অর্পণ করিলেন। ঠাকুর

সমস্তগুলি খুলিয়া নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিয়া বালকের ন্যায় উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন এবং মহানন্দ দাদার রুচিবোধ ও আন্তরিকতার উচ্চ প্রশংসা করিতে করিতে আশ্রমস্থ সকলকে ডাকিয়া জিনিসগুলি দেখাইতে লাগিলেন। সমস্ত বস্তুগুলি শ্রীগুরুর আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারিয়াছে এবং সমস্তই সেবায় লাগিল মনে করিয়া মহানন্দ দাদা নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। এদিকে ঠাকুর বড় দিদিকে (মনোরমা শ্রীমাণী) ডাকিয়া বলিলেন—"এই সব জিনিসগুলির উপর থেকে আমার নাম (সেলাই খুলে) তুলে ফেল এবং নামাঙ্কিত চিঠি লেখার কাগজ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেল। মহানন্দ আমাকে ভোগবিলাসী বাবু সাজাতে চায়, এইভাবে আমার নাম জাহির করতে চায়, এ সবের প্রশ্রয় দিলে ক্রমে আশ্রমের আদর্শ নষ্ট হয়ে যাবে।"

এত সব দামী জিনিস এবং মহানন্দ দাদার প্রাণভরা আন্তরিকতা এইগুলির মধ্যে জড়ান, বড় দিদি ইতস্তত করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হঠাৎ নিজেই উঠিয়া পড়িলেন এবং সমস্ত জিনিসগুলি একত্রিত করিয়া তাহার উপর কেরোসিন তৈল ঢালিয়া অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইলেন।

——:o:——

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে
লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজী মহারাজ এক সময় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিরিডি গমন করেন। সঙ্গে বহু শিষ্য শিষ্যা ছিলেন। তন্মধ্যে জনৈকা শিষ্যা সেখানে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। চিকিৎসা চলিল—কিন্তু কোন উন্নতিই দেখা গেল না। অবশেষে ঠাকুর অসুস্থা শিষ্যা এবং তাহার স্বামীকে চন্দন-নগর পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে অন্যান্য-দের সঙ্গে লইয়া ভুবনেশ্বর চলিয়া যান। শিবরাত্রি সম্মুখে—ভুবনেশ্বর যাওয়ার ইহাও একটি কারণ ছিল।

কিছুদিন পরে অসুস্থ গুরুভগ্নীটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে একখানি পত্র লিখেন। পত্রের বিশেষ কথা হইল তাহার অসুস্থতার জন্য ডাক্তার তাহাকে মাগুর মৎস্যের ঝোল খাইতে বলিতেছেন। ডাক্তারের কথায় তাহার স্বামীও তাহাকে এজন্য পীড়াপীড় করিতেছেন। অথচ তাহার নিজের মৎস্যের ঝোল খাইবার প্রবৃত্তি কিছুতেই হইতেছে না। এদিকে গুরুভ্রাতাটি যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী কিছুতেই মৎস্যের ঝোল খাইতে রাজী

হইতেছে না, তখন খুব বিরক্ত হইয়া ঠাকুরকে এ বিষয় জানাইয়া পত্র দিলেন এবং ঠাকুর যাহাতে তাহার স্ত্রীকে মৎস্যের ঝোল খাইতে রাজী করান, সেজন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন।

গুরুভগ্নীটি ছিলেন বড় ভক্তিমতী ও বিশ্বাসপরায়ণা। বাল্যকাল হইতেই নিরামিষ-ভোজী। শ্রীশ্রীঠাকুর পত্র পড়িয়া তাহার জবাব দিলেন জরুরী তারযোগে। লিখিলেন, "শ্রীমতী শরীর অপেক্ষা তাহার আত্মার বিশুদ্ধতার জন্য আগ্রহান্বিতা এবং এ বিষয়ে যত্নপরায়ণা; ইহা যে কিছু অন্যায় কার্য্য তাহা আমি মনে করি না, মৎস্যের ঝোল না খাইলে যদি তুমি তাহার উপযুক্ত সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিতে চাও কিংবা না পার, তবে তাহাকে যে কোন ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাইতে পার। তবে ইহাও সত্য বলিয়া জানিবে যে তাহাকে দেখিবার নিশ্চয়ই কেহ রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ কথায় গুরুভ্রাতাটির অভিমানে বড় আঘাত লাগিল—তিনি রেলের একটি দ্বিতীয় শ্রেণী কামরা রিজার্ভ করিয়া একজন ডাক্তারসহ ভুবনেশ্বর যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ভুবনেশ্বর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুভগ্নীটি জ্বরে কাতর এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে গৌরীকুণ্ডে স্নান করিয়া আসিয়া সকলের সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। আদেশ পালিত হইল। শ্রীগুরু-কৃপায় শিষ্যাটির রোগ নিরাময় হইল এবং অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

গ্রীষ্ম কাল। দ্বিতলের ছাদে আমরা অনেকে নিদ্রামগ্ন। একদিন মধ্যরাত্রে কোন একটি গুরুভার বস্তুর পতনের শব্দে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম সেই গুরু-ভগ্নীটি ছাদের এক প্রান্তে আহত অবস্থায় পতিত হইয়া ক্লেশসূচক শব্দ করিতেছে ও অনুচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছে।

শিষ্যাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বের ঘরে শুইয়াছিলেন। কোন একটা শব্দ শুনিয়া তাহার মনে হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষম লাগিয়া শ্বাসকষ্ট হইতেছে। এই কথা মনে হইবামাত্র তিনি এক গ্লাস জল নিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছিবামাত্র কোন অদৃশ্য দুই বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া প্রায় ১৫।১৬ হাত দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঐ শব্দ শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি তাহার নিকট যাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি তোদের কত করে বারণ করেছি,—রাত্রে আমি না ডাকলে কেউ আমার ঘরে ঢুকবে না। তোরা যেমন আমাকে নিয়ে আনন্দ করিস, তেমনি যারা চলে গেছে বা দূর হতে ব্যাকুলভাবে আমাকে ডাক্‌ছে মাঝে মাঝে আমাকে দেহ ছেড়ে তাদের কাছে যেতে হয়। চার জন মহাপুরুষ সর্ব্বদা আমার আসন রক্ষা করেন। এ অবস্থায় কেহ আসন স্পর্শ করলে, তাঁরা শাসন করবেন বৈকি? কাজেই খুব সাবধান। যা'ক তোর ভোগ অতি অল্পের মধ্যে কেটে গেল।" আমি নিকটেই ছিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলাম।

শিবরাত্রি। প্রায় তৃতীয় প্রহরে আমরা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত। ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হোম করিতে বসিলেন। তাহা দেখিয়া আমরা কীর্ত্তন বন্ধ করিলাম। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "তোমাদের কীর্ত্তন বন্ধ করতে হবে না, তোমরা কীর্ত্তন চালিয়ে যাও।" আমি তাঁহার কথায় বলিলাম, "এতে আপনার ব্যাঘাত হবে ত?" শ্রীশ্রীঠাকুর আমার কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইলেন,—তৎপর মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য বল্‌তে তোমরা শুধু বীর্য্যধারণই মনে কর। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা শুধু তা' নয়। মনে কর একটি বড় হল ঘরে বক্তৃতা হচ্ছে,—তুমি পাশের লোকের পকেটের ঘড়ির আওয়াজ শুন্‌ছ। বহু বাদ্য যন্ত্রের কনসার্ট বাজছে,—তুমি ঐ মিলিত ধ্বনি হতে এক একবার এক একটি যন্ত্রের ধ্বনি আস্বাদন কর্‌ছ। আকাশে এক ঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে,—তুমি ঝাঁকের মধ্য হতে একটি মাত্র পাখীকে দেখছ। নদীর স্রোতে নানা রকম ফুল ভেসে চলেছে,—তুমি তার মধ্য হতে একটিকে মাত্র লক্ষ্য করছ। বহু ব্যক্তি নানা রকম সেণ্ট মেখে এসেছে। সব রকম মিলে একটা অদ্ভুত গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে,—কিন্তু তুমি প্রত্যেকটি গন্ধ পৃথক পৃথক ভাবে অনুভব করছ। বহু রকমের ফুলের গন্ধ হতে তুমি পৃথক পৃথকভাবে এক একটি ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করছ। ঝাল টক মিষ্টি মিশিয়ে খাবার তৈরী হয়েছে,—কিন্তু তোমার জিহ্বা পৃথক পৃথকভাবে এক একটি স্বাদ আস্বাদন করছে। এই রকম ভাবে যিনি দশ ইন্দ্রিয় এবং দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে আপন ইচ্ছামত কাজে

লাগাতে পারেন জানবে তিনিই প্রকৃত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তোমরা কীর্ত্তন করে যাও তাতে আমার কোন অসুবিধা হবে না এবং ব্যাঘাতও হবে না।" কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

———

অদ্ভুত দর্শন ও আত্মসমর্পণ

বাঁকুড়ার শ্রীবারাণসী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ২২ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ৬৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমাজে নিয়মিত যোগদান করিতেন এবং ব্রাহ্মসাধন প্রণালীমত কঠোর নিয়মে সাধন করিতেন। নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবলে তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন এবং ধর্ম্মপথেও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে বোধ করিতেন। কিন্তু প্রাণে প্রকৃত শান্তি লাভ হয় নাই, কোন একটা অবস্থা স্থায়ী হয় না অনুভব করিয়া তিনি বড় মনঃকষ্টে দিন কাটাইতেন। অবশ্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনাদর্শ, ধর্ম্মভাব ও উদার মতবাদ তাঁহার প্রাণে সান্ত্বনা ও শক্তি জোগাইত এবং তাঁহাদের সকরুণ স্নেহভালবাসা তাঁহাকে সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত রাখিত।

১৩০৩ সালের শেষে তিনি কিছুদিনের অবসর লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের কলিকাতার বাটিতে অবস্থানকালে গোসাঁইজীর পুণ্য সঙ্গলাভ আকাঙ্ক্ষায় হ্যারিসন রোডের বাসায় যান। ‘তুমি ত আমার ঘরের ছেলে’ বলিয়া গোসাঁইজী তাঁহার প্রতি সকরুণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করেন এবং সেই প্রাণস্পর্শী দৃষ্টি বারাণসী বাবুকে অভিভূত করিয়া

ফেলে। তিনি দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে যাইবেন এমন সময় স্মরণ হইল যে নিজ স্ত্রীর নিকট তিনি সত্যে আবদ্ধ আছেন যে সস্ত্রীক দীক্ষা লইবেন। মনে মনে স্থির করিলেন যে পরে ছুটি লইয়া আসিয়া উভয়ে এক সঙ্গে সাধন লইবেন। কিছুদিন পরেই গোস্বামীপ্রভু পুরীধামে গমন করেন বলিয়া তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই।

১৩৩৪ সালের মাঘ মাসে একদিন জনৈক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয় যে শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজী সাব-রেজিষ্ট্রার শ্রীসন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিতেছেন। বন্ধুটি জানিতেন যে বারাণসী বাবু গোসাঁইজীকে ইষ্টরূপে অন্তরে পূজা করেন এবং গোসাঁইজীর যোগ্যতম শিষ্য ব্রহ্মচারিজীর সঙ্গলাভে উপকৃত হইতে পারেন। সংবাদটি তাঁহার প্রাণে প্রবল আকর্ষণ আনিয়া দিল এবং তিনি সেইক্ষণে সন্তোষ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া জানিলেন যে বিকেল বেলা সাক্ষাতের সময়। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় ৩টার সময় সন্তোষ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইলে ক্রমে ২।৪ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইল। ব্রহ্মচারী মহারাজ নিজ প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া স্মিতমুখে প্রথমে বারাণসী বাবুর দিকে অপলক চক্ষে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন এবং পরে আসন গ্রহণ করিলেন। সৎসঙ্গ চলিতে থাকিল এবং কথাপ্রসঙ্গে বারাণসীবাবু ভাববিহ্বল অবস্থায় নিজের প্রাণের কথা,—কেমন করিয়া গোসাঁইজী এক

মমতাপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার মনপ্রাণ সব কাড়িয়া লইয়াছেন, গোসাঁইজীকে দর্শনাবধি এই ত্রিশ বৎসর কাল এমন কোন সাধু বা মানুষ নজরে পড়ে নাই যাঁহার নিকট দীক্ষালাভের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন ইত্যাদি বলিতে বলিতে হঠাৎ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "না, না, গোসাঁইজীর নিকট আমার যখন প্রথম দীক্ষা হয় নাই তখন আর আমার দীক্ষার প্রয়োজন নাই।" শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তভাবে নানা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে বারাণসী-বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হঠাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি উপদেশ (দীক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে) বারাণসীবাবুর স্মরণে আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রহ্মচারিজীর মূর্ত্তির স্থলে সাক্ষাৎ গোসাঁইজীকে দর্শন করিয়া অবাক্‌বিস্ময়ে বিস্ফারিত লোচনে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন। তারপর গদ্‌গদ-ভাবে বলিলেন,—'আমি যে আপনার ভিতরে গোসাঁইজীকে দর্শন করিতেছি, আপনি তাঁহার হাতে গড়া ব্রহ্মচারী, আপনি যদি কৃপা করিয়া গোসাঁইজীর সেই জিনিস কিঞ্চিন্মাত্র কৃপণতা না করিয়া আমাকে দেন তাহা হইলে আমার আশা পূর্ণ হয়।' তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—'শক্তিসঞ্চারই ত প্রকৃত দীক্ষা এবং তাহা আপনার তাঁহার নিকট হইয়া গিয়াছে, আমি তাঁহার নিকট হইতে যে সাধন পাইয়াছি এবং যে অবস্থা অর্জ্জন করিয়াছি আপনাকে আমি তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে দিব, আপনি অবশ্য উপকৃত হইবেন।' পরদিন সকাল ৮টার সময় বারাণসী

বাবুর দীক্ষা হইল এবং তিনি সাক্ষাৎ সদাশিব গোসাঁইজীর কৃপালাভ করিলেন ইহা দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন।

৬৬ বৎসর বয়সে বারাণসীবাবুর জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল এবং তিনি অতি দ্রুত উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহ সম্ভোগের অধিকারী হইলেন। হাজার গোপন করিবার চেষ্টা থাকিলেও শ্রীনামের শক্তির ও প্রাণায়ামের ক্রিয়া লোকাপেক্ষা না রাখিয়া স্থানে ও অস্থানে প্রকাশ হইয়া পড়িত এজন্য তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন। নামানন্দে প্রায় সময় অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় থাকিতেন। সাধন লাভের দেড় বৎসর পর ১৩৩৬ সালে মহাহোম উৎসব উপলক্ষে বারাণসীবাবু সন্তোষবাবু ও তাঁহার জামাতা অধ্যাপক রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাত্রি ৮টায় চন্দননগর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিতলে পীড়িতাবস্থায় দরজার বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শয্যাগত ছিলেন। বারাণসী বাবু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সেই অবস্থায় থাকিয়াই বলিলেন—'বারাণসীবাবু এলেন—আপনাকে দেখে বড় সন্তুষ্ট হলাম।' ২০।২১ মাস সাক্ষাৎ নাই, আসিবারও কোন কথা জানান হয় নাই, এতদিন কোন পত্রালাপও করেন নাই, এই অস্পষ্ট আলোকে উল্টামুখে শয়ান থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কি করিয়া তাঁহাকে চিনিলেন ভাবিয়া বারাণসীবাবু বিস্ময়াভিভূত হইলেন। ৺বিজয়া দশমীর দিন সমবেত প্রায় ২৫০০ হাজার শিষ্য একে একে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং তিনি মিষ্ট ৺মহাপ্রসাদ দানে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বারাণসীবাবু

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বাষ্পপূর্ণ লোচনে স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন—"বারাণসীবাবু, আপনি আসায় বড়ই আনন্দলাভ করিলাম, বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম, বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম।' সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, সুশিক্ষিত, ধনবান্ বহু শিষ্য উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে এইভাবে কৃতার্থ করায় বারাণসীবাবু যুগপৎ বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভক্তিবাষ্পাকুললোচনে অনিমেষে শ্রীগুরু পানে তাকাইয়া রহিলেন, যেন সমাধিস্থ। জয় গুরু শ্রীগুরু !!

—:০:—

সদ্‌গুরুর সূক্ষ্ম আকর্ষণ, স্বাস্থ্য ও পরমার্থ লাভ

নড়াইল (যশোহর) বাসী সতীর্থ অন্নদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা আর, জি, কর হাসপাতালে ডাক্তারী শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া ব্যবসার উন্নতি ও অনুকূল পরিবেশ লাভের আকাঙ্ক্ষায় বন্ধুবর শ্রীকিরণচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের (পরে স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ) জন্মস্থান খালিয়া গ্রামে আশ্রয় লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হন। কিরণকাকা, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বিধুসুন্দরী দেবী সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রভুর আশ্রিত ছিলেন। বিধুসুন্দরী দেবীর একমাত্র পুত্র নলিনীবাবু (তখন কলেজের ছাত্র) দাদা গোঁসাই শ্রীশ্রীযোগজীবনজীর শিষ্য ছিলেন। এই ধর্ম্ম পরিবারের আওতায় থাকিয়া সৎসঙ্গ ও সদালোচনাগুণে অন্নদাবাবুর মধ্যে ক্রমশঃ ধর্ম্মভাব পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। মনে মনে গোঁসাইজীর শ্রীচরণে কৃপালাভের প্রার্থনা জানাইতে থাকেন।

১৩১৯ সালের শেষের দিকে ডাক্তার অন্নদাবাবু কঠিন রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ শয্যাগত হইয়া পড়েন।

স্নেহময়ী বিধুসুন্দরী রোগশয্যা পার্শ্বে থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবানের নাম শুনাইতেন এবং গোঁসাইজীর ও ব্রহ্মচারী কুলানন্দজীর অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য ও কৃপার প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতেন। বহু চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা সত্বেও রোগের উপশম দেখা গেল না। প্রবল জ্বরের সঙ্গে রক্তবাহ্য ও রক্তবমি হইতে লাগিল। সকলে জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। এই অসহায় অবস্থায় একদিন অন্নদাবাবু বিধুসুন্দরীকে কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গোঁসাইজী স্থূল-দেহে না থাকিলেও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ব্রহ্মচারী ত আছেন এবং তিনি কি তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া কোন প্রতিকার করিতে ও তাঁহার অভয় চরণে আশ্রয় দিতে পারেন না? এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া বিধুসুন্দরী দেবী অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং অনেক ভরসার বাণী শুনাইলেন।

সেই দিন মধ্য রাত্রে অন্নদাবাবু স্বপ্নে দেখেন যে একজন অনিন্দ্য সুন্দর প্রলম্বজটাধারী সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান আছেন এবং হাতছানি দিয়া তাঁহাকে অমুক দিন তাঁহার নিকট চলিয়া আসিতে আদেশ করিতেছেন, কারণ তিনি তাঁহারই প্রতীক্ষায় সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

প্রত্যূষে স্বপ্নবৃত্তান্ত বিধুদেবীর নিকট বলিলে গোঁসাইজীর অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় কৃতজ্ঞতা-বারিতে ভরিয়া উঠিল এবং তিনি নিজ পুত্রকে সঙ্গে দিয়া অন্নদাবাবুকে পুরী পাঠাইতে উদ্যোগী হইলেন। নলিনীবাবু কুলীর সাহায্যে বহু কষ্টে অন্নদাবাবুকে কোলে করিয়া

গাড়ীতে তুলিয়া ১২ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা পৌঁছিলেন এবং সেই দিনই রাত্রিতে এক্সপ্রেস ট্রেনে পুরী রওয়ানা হইলেন। পুরীতে ইতিপূর্ব্বে ইহারা কেহ আসেন নাই, ব্রহ্মচারীজীও তাঁহাদের অপরিচিত, ঠিকানাও জানা নাই, কোথায় কিভাবে গিয়া উঠিবেন ভাবিয়া উভয়ে দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে ও গোসাঁইজীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সকালবেলা গাড়ী পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিলে জনৈক ভদ্রলোককে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া 'খালিয়া হইতে অন্নদা ডাক্তার আসিয়াছেন কি?' বলিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরাঘুরি করিতে দেখিলেন। নলিনীবাবু আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে ব্রহ্মচারীজী কৃপা করিয়া তাঁহার শিষ্য মহানন্দ নন্দী মহাশয়কে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বর্গদ্বারে লইয়া যাইতে। ভয়ভাবনা দূরে গেল, অসুস্থ অন্নদাবাবুকে অতিকষ্টে কোলে করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে আনা হইল। স্বপ্নে যেমনটি দেখিয়াছিলেন অন্নদাবাবু প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মচারীজীর সেই অপূর্ব্ব জটাশঙ্করমূর্ত্তি সন্দর্শনে বাষ্পাকুললোচনে প্রণাম করিতে গিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন। অতি ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীর, পথের পরিশ্রম তাঁহাকে অতিশয় কাতর করিয়াছিল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ব্রহ্মচারীজীর আদেশ ক্রমে অন্নদাবাবু সমুদ্রস্নান, শ্রাদ্ধশান্তি ও পিণ্ডদান করিয়া জটিয়াবাবার আশ্রমে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নীত হইলেন। ব্রহ্মচারীজীর সেই অপরূপ রূপ দর্শনমাত্র তাঁহার শরীর ও মনের দুর্ব্বলতা যেন অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। পার্শ্বের কক্ষে তখন যোগিরাজ

শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ অবস্থান করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া অন্নদাবাবু কৃতার্থ বোধ করিলেন। 'সদ্‌গুরু লাভ হো জায়েগা বেটা' বলিয়া স্বামীজী স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাত্রি ৩টার সময় ব্রহ্মচারিজীর আহ্বানে অন্নদাবাবু সাধন কুটিরে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারিজী হোম সমাপন করিয়া কিছুক্ষণ ভাববিহ্বলভাবে স্তবস্তুতি করিলেন, বিধি ও নিষেধ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া যোগীজনতুর্ল্লভ মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। শ্রীনাম প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্নদাবাবু যেন একটা অপূর্ব্ব শক্তির খেলা নিজের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলেন, দেহ আধারটি যেন শুদ্ধ পবিত্র হইয়া গেল, নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল বোধ করিলেন, নামের প্রবাহ প্রতি শিরায় শিরায় গমনাগমনে শরীরে যেন আনন্দ শিহরণ জাগিতে লাগিল, নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিলেন।

সমাধি-আশ্রমে সকলে গোসাঁইগণ সঙ্গে ৭।৮ দিন পরমানন্দে কাটাইয়া অন্নদাবাবু পুনঃ খালিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমেই বিধুদেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহারই অপার সহানুভূতি, প্রার্থনা ও সক্রিয় সাহায্যে তিনি সদ্‌গুরুর প্রত্যক্ষ কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া অকপট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন।

নির্জ্জনে সাধন ভজনের সুবিধা হইবে বলিয়া অন্নদাবাবু যামিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উঠিয়া গেলেন এবং সেইখানেই ডাক্তারী করিতে লাগিলেন। বৎসর কয়েক পর

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিবার প্রবল আগ্রহে পূজার সময় মহাহোম উৎসব উপলক্ষে কিরণকাকার সমভিব্যাহারে তিনি চন্দননগর ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গলাভে নিজেকে ধন্য বোধ করিলেন।

একদিন সকালে কিরণকাকাকে চা সেবা করিতে দেখিয়া অন্নদা-বাবুর চা খাইতে লালসা জাগিল এবং কিরণকাকা তাঁহার ব্যবহৃত নারিকেল মালাতেই অবশিষ্ট চা তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমস্ত দিন খুব গম্ভীর ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না দেখিয়া অন্নদাবাবু খুবই অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অবসরে অন্নদা দাদার ডাক পড়িল এবং উচ্ছিষ্ট বিচার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক উপদেশ দিলেন। এই উচ্ছিষ্ট চা সেবার অপরাধে তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে তবে বিশেষ ক্ষতি হইবে না বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন।

স্বস্থানে ফিরিলে সেইদিন বন্ধু ক্ষেত্রনাথ সেন কবিরাজ মহাশয় (পরিব্রাজক স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর শিষ্য) বৈকালে এক জোড়া সুপুষ্ট কাঁচকলা দিয়া গেলেন এবং গলদা চিংড়ী আনাইয়া সেই কাঁচকলা দিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল এবং রাত্রে অন্নদা দাদা তৃপ্তিসহকারে অন্নাহার করিলেন। মধ্য রাত্রে পেটে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল ক্রমে ঘন ঘন রক্তবাহ্য ও রক্তবমি হইয়া তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলিল। কাতর প্রাণে শ্রীগুরুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রফুল্ল দিদি পুস্তক দেখিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাই-লেন এবং টগরগঞ্জের ডাক্তার জ্যেষ্ঠতাতকে আনিতে লোক

পাঠাইলেন। ভোর রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় অন্নদা দাদা সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন যেন কেহ তাঁহার পেটের উপর শীতল হস্ত লেপন করিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা দূরীভূত হইল। ঘুম ভাঙ্গিলে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে তাঁহারা কেহ তাহার পেটে হাত বুলান নাই তখন শ্রীগুরুকৃপা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন এবং অযাচিত অপার করুণা স্মরণে চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুকে পত্রযোগে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলে তিনি তদুত্তরে জানাইলেন—'এবার শ্রীভগবানই তোমাকে বাঁচাইয়াছেন, অশেষ করুণা তাঁহার।' জয় গুরু !

——:০:——

সর্ব্বসন্তাপহারী ঠাকুর কুলদানন্দ

১৩২২ সালে, আশ্বিন মাসে সতীর্থ ডাঃ অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাহোম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সস্ত্রীক চন্দননগর ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিজনবালা সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিতেন। ব্যাথাহারী ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ মহারাজ একদিন একটি জোড়া-কলা তাহাকে খাইতে দিয়া বলিলেন—'দেখরে, আমি শুনেছি এই খেলে নাকি সন্তান লাভ হয়।' বিজন দিদি কৃপাশীর্ব্বাদ মনে করিয়া পরম আগ্রহে সেই প্রসাদ পাইলেন। কয়েক মাস পরেই তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা হন এবং ১০ই অগ্রহায়ণ একটি পুত্ররত্ন প্রসব করেন। শিশুর নাম গুরুদাস রাখা হয়।

১৩২৬ সালের মাঝামাঝি ডাঃ অন্নদাচরণ খালিয়া হইতে নড়াইল সহরে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে তিনি স্ত্রী ও শিশুসন্তানসহ ভগবান্ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-প্রভুর তিরোভাব তিথি মহোৎসবে যোগদান উদ্দেশ্যে পুরী 'ঠাকুরবাড়ী' আশ্রমে যান। বেশী দিন অনুপস্থিত থাকিলে ব্যবসায়ে ক্ষতির আশঙ্কা অথচ প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে ৺রথযাত্রা দেখিয়া যান। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন অনুকূল অবস্থার

সৃষ্টি করিলেন। আশ্রমের প্রধান কর্ম্মী মহানন্দ নন্দী জটিল গলক্ষত রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং চিকিৎসার ভার অন্নদা দাদার উপর পড়িল। সুযোগ্য চিকিৎসায় রোগ ক্রমশঃ উপশম হইতে লাগিল এবং মহানন্দ দাদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত হইয়া ডাক্তারকে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীগুরু সঙ্গলাভের আনুকূল্য অপ্রত্যাশিত-ভাবে পাইয়া অন্নদাচরণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

একদিন জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া অনুনয় বিনয় সহকারে সাধন প্রার্থনা করিলেন এবং হস্তরেখা দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দিতে আব্দার জানাইলেন। 'নীচে অন্নদা ডাক্তার ভাল হাত দেখতে পারে' বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ডাক্তার প্রথমে হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিতে চাহিলে ভদ্রলোক শ্রীগুরুর কথা নিবেদন করিলেন। অন্নদা বাবু কোনও দিন জ্যোতিষ চর্চ্চা করেন নাই কাজেই ঠাকুরের এইরূপ নির্দ্দেশে নিজেকে বিব্রত মনে করিলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া তিনি ভদ্রলোকের দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে ধারণ করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে দেখিলেন যেন সুস্পষ্ট অক্ষর ফুটিয়া উঠিতেছে এবং তিনি তাহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। ভদ্রলোকের কুৎসিত জীবনের গোপন কথা এইভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ায় তিনি লজ্জায় স্থান ত্যাগ করিলেন। ডাক্তার শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন—'অপ্রিয় কথাগুলি আমার মুখ দিয়ে বলা ভাল মনে করিনি।'

২৯শে জ্যৈষ্ঠ সকালে যখন ব্রহ্মচারিজী জটিয়াবাবার শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে নিজ আশ্রমের দ্বিতলে উঠিতেছিলেন তখন সেই স্থানে ক্রীড়ারত ৩॥০ বৎসর বয়সের শিশু গুরুদাস হঠাৎ তাঁহার পদযুগল বক্ষে সজোরে ধারণ করিয়া বলিল—'আমাকে সাধন দিবেন বলুন, নইলে পা ছাড়ব না।' শ্রীগুরু শিশুর পৃষ্ঠে সস্নেহে মৃদু আঘাত করিয়া 'সময় হইলে পাইবে' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। সেই দিনই ঠাকুর অন্নদা ডাক্তার, মহানন্দ নন্দী প্রভৃতি সহ ভুবনেশ্বর রওয়ানা হইলেন। ২রা আষাঢ় গুরুদাসের ভীষণ জ্বর হইল, গাত্রোত্তাপ ১০৪।৫° ডিগ্রি উঠিল, বিজনবালা শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাইলেন। হঠাৎ বিকাল বেলা অন্নদা দাদাকে ঠাকুর পুরী যাইতে আদেশ করিলেন এবং তিনি আসিয়া শিশুপুত্রের ঐ অবস্থা দেখিয়া শ্রীগুরুর অন্তর্য্যামিত্ব ও কৃপা উপলব্ধি করিলেন এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। পরদিন ঠাকুর সদলে ভুবনেশ্বর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিজনবালা ছেলের সমস্ত অবস্থা ঠাকুরকে বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন কারণ শিশুপুত্রের এই অবস্থার দরুণ তাহার ৺রথযাত্রা দর্শনের সকল আশা তিরোহিত হইতে চলিল। শ্রীগুরু খুব ভরসা দিলেন। ৪ঠা আষাঢ় সকালে গুরুদাসের শরীরে জ্বর নাই এবং দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর সদলে বড়দাণ্ডায় গিয়া ৺জগন্নাথদেবের রথের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রথ দর্শন ও রজ্জু আকর্ষণ করিয়া সকলে সন্ধ্যায় ফিরিলেন এবং গোসাঁই আশ্রমে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাইলেন। গুরুদাসও মহাপ্রসাদ পাইয়া নিজেকে সবল বোধ করিল।

মধ্য রাত্রে গুরুদাস প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং ভুল

বকিতে থাকে। ১২ই আষাঢ় নূতন উপসর্গ রক্তবাহ্য হইয়া শিশুপুত্র যেন বিছানায় মিলাইয়া গেল। রেলওয়ে ডাক্তার হরিশ সেন নানা ইন্‌জেকশান্ ও ঔষধ দিয়া বিফলমনোরথ হন। ১৪ই আষাঢ় সকলে রোগীর প্রাণের আশা ত্যাগ করেন। গাত্রোত্তাপ ১০৮° এবং বিকারগ্রস্ত অবস্থা। শ্রীগুরু অন্নদা দাদাকে ডাকিয়া বলেন—'আমাকে ঋণমুক্ত কর। আমি যে গুরুদাসের নিকট দীক্ষাদানে প্রতিশ্রুত আছি।' ডাক্তারদা বলিলেন—'ও ত চলেই যাচ্ছে যদি নাম পায় তবে তার আত্মার কল্যাণই হবে।' কৌশলে রোরুদ্যমানা বিজন দিদিরও অনুমতি নেওয়া হইল। শ্রীগুরুর ইঙ্গিতে রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় রোগীর ঘরে ধূপধূনা দেওয়া হইল, তুলসী বৃক্ষ শিয়রে স্থাপিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া শিশুর মস্তকে বাম হস্ত এবং বক্ষে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া ধ্যানে মগ্ন রহিলেন। আধ ঘণ্টা পর গাত্রোত্তাপ ১০১° হইল। আরও অর্দ্ধ ঘটিকা এইভাবে কাটিল এবং জ্বর ১০০° নীচে গেল। শ্রীগুরু তখন গুরুদাসকে তিন বার নাম ধরিয়া ডাকিয়া সচেতন করিলেন। সে বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীগুরুর মূর্ত্তি দর্শন করিতে এবং বাণী শ্রবণ করিতে থাকিল। সংক্ষেপে উপদেশ দিয়া ঠাকুর বালকের কর্ণমূলে মহামন্ত্র শুনাইলেন। আশ্রমস্থ সকলে শঙ্খ ও উলুধ্বনি দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীনাম প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে মনে করিয়া বিজনবালা অজ্ঞান হইয়া ধরাশায়ী রহিলেন। নাম-প্রাপ্তির পর বালক যেন নিজেকে সুস্থ ও সবল বোধ করিল

এবং ক্ষুধার কথা বলিয়া মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিল। শ্রীগুরু কিছু মহাপ্রসাদের জল প্রথমে দিয়া পরে অন্য যে কোন খাদ্য দিতে বলিলেন এবং দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। এবং আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয়ান রহিলেন। মধ্য রাত্রে তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া ডাক্তারেরা আসিয়া দেখিলেন যে জ্বর ১০৬° এবং রক্তবাহ্য হইতেছে। সিভিল সার্জ্জেনকে ডাকা হইল কিন্তু শ্রীগুরু ইন্‌জেকশান লইতে বা ঔষধ খাইতে অস্বীকার করিলেন। অন্নদা ডাক্তার যে হোমিও ঔষধ দিলেন তাহাতেই উপকার দেখা গেল এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ২।৩ দিন মধ্যে সুস্থ হইলেন। বালক গুরুদাস ক্রমশঃ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। আজ সে হাওড়ায় রেলওয়ে গার্ড এবং শ্রীগুরুর অপার করুণা স্মরণে চিরকৃতজ্ঞ। জয় গুরু!

ব্রহ্মচারিজীর শক্তিসঞ্চার বৈশিষ্ট্য

ময়মনসিং জেলার সতীর্থ ডাক্তার শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত সদ্‌গুরু লাভের আকাঙ্ক্ষায় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়াও মনের মত কর্ণধারের সন্ধান পায় নাই। শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ গ্রন্থগুলি পাঠ ও শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীর চিত্রালেখ্য দর্শন করিয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিবার জন্য প্রাণে গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন এবং সেইমত পত্রযোগে প্রার্থনা জানান। ১১ই ভাদ্র ১৩৩৩ সালে প্রত্যূষে কলিকাতা ১২নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে উপস্থিত হইবার নির্দ্দেশ পাইয়া উপযুক্ত সময়ে গঙ্গাস্নানান্তে পুঁটিরাম মোদকের দ্বিতলের ঘরে বসিয়া শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরে কোন ইঙ্গিত পাইয়া দীক্ষার্থি-গণকে পর দিন সকালে উপস্থিত হইতে বলেন। ১২ই ভাদ্র অক্ষয় দাদা যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্য করেন যে হল-ঘরের মধ্যস্থলে শ্রীগুরু আসনে সমাধিস্থ, তাঁহার সম্মুখে একটি পর্দ্দা টাঙ্গান এবং একদিকে পুরুষেরা অন্যদিকে স্ত্রীলোকেরা উপবিষ্ট। স্থানটি হোমের পবিত্র ধোঁয়ায়, পুষ্প ও ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত। শ্রীগুরুর তুষারশুভ্র দেবদেহ যেন পূর্ব্ব দিনের অপেক্ষা তিন গুণ বর্দ্ধিত এবং তাহা হইতে স্নিগ্ধ-জ্যোতি

বিচ্ছুরিত হইতেছে। জটাগুলি উভয় পার্শ্বে যেন ফণীর মত সারা দেহে বিলম্বিত, ললাট-মধ্য অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর গদগদভাবে গুরুগম্ভীর স্বরে স্তবস্তুতি করিয়া সাধনের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে উপদেশ দান করিলেন। 'জয়গুরু' শব্দ বার বার উচ্চারণ করিয়া শ্রীগুরু যেমন ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন অমনি ঘরটি হাসিকান্নার রোলে ভরিয়া উঠিল। অক্ষয় দাদার চক্ষুতে জল নাই, তিনি যেন শুধু মন্ত্রমুগ্ধ নেত্রে সাক্ষাৎ সদ্‌গুরু মহাদেবের অপূর্ব্ব রূপ দর্শনলাভে বিভোর। একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিশিখা দেবদেহের ললাট হইতে বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং জ্যোতি যেন অক্ষয় দাদার দেহে নিপতিত হইল এবং তিনি অমনি যেন কোন অলৌকিক শক্তির দ্বারা সজোরে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগুরুর দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার দেহস্মৃতি বিলুপ্ত হইল। বহুক্ষণ পর দেহস্মৃতি ক্রমশঃ ফিরিল এবং তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যেন কোন বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার প্রত্যেক শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত শরীর যেন নামানন্দে হাবুডুবু খাইতেছে, নবজন্ম লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। সদ্য নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বোধ করিতেছেন, সাধন লাভের পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী অবস্থা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিলেন। নরকের কীট আজ স্বর্গের দেবতা। 'দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ' কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিলেন। 'কুমীরে পোকায় আরসোলা ধরার মত, সদ্‌গুরু শক্তি সঞ্চার করে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ক্রমে আত্মসাৎ করে নেন।' (স গু স—৩।২৫৮)

আত্মসম্বিত ফিরিলে অক্ষয় দাদা সামান্য জলযোগ করিয়া শ্রীগুরু নিকট বিদায় লইয়া রাস্তায় নামিলেন। সম্মুখে গোলদীঘির বাগানে একটি পুষ্পাকীর্ণ বৃক্ষ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টির সম্বন্ধে চিন্তায় মগ্ন হইলেন, অশ্রুকম্পপুলকে দেহ যেন বিমথিত হইতে লাগিল। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিয়া অন্যমনস্কভাবে পথ অগ্রসর হইতেছেন। কিছু দূরে পরমাসুন্দরী এক যুবতীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ভাব পুনরায় বৃদ্ধি পাইল, খরবেগে নাম চলিতে লাগিল, অস্বাভাবিক কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, মা মা বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। সেই মধুময় অবস্থার বর্ণনা কোন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাত্রের ট্রেনেই দেশের দিকে রওয়ানা হইলেন।

স্বগ্রামে পৌঁছিয়া তিনি বাড়ীতে সমস্তই বিপরীত অনুভব করিতে লাগিলেন। স্ত্রী পুত্রাদির উপর ও সংসারের উপর যেন কোন আকর্ষণই নাই, কামক্রোধাদি সমস্ত রিপুই যেন অন্তর্হিত। মন সর্ব্বদাই অন্তর্ম্মুখী, মহানন্দে দেহে সর্ব্বদাই শিহরণ জাগে। নাম কখনও আপনা হইতে সবেগে চলিতে থাকে, দেহজ্ঞান তিরোহিত হয়। সর্ব্বদা সমাধি অবলম্বনে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা।

একদিন ঐ অবস্থায় তাঁহার খুল্লতাত ভগ্নী ষোড়শী যুবতী, শ্রীমতী আশালতা কতগুলি সোনার চুরী আনিয়া তাঁহার হাতে পরাইয়া দেওয়ার আবদার ধরিল। যুবতীকে স্পর্শ করা মাত্র নামের বেগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল, নাভিমূল ক্রমশঃ উষ্ণ হইয়া

ঐ স্থান হইতে একটি গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যেন চক্রাকারে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল এবং আনন্দময় অনুভূতি জাগিল। পুরুষাঙ্গটি সঙ্কুচিত হইয়া যেন ভিতরপানে ঢুকিয়া গেল। বিপদ গণিয়া বিছানায় আশ্রয় লইতেই বহুক্ষণ সংজ্ঞা-শূন্য রহিলেন।

এক দিবস জনৈক রোগাক্রান্তা মুসলমান যুবতী রমণীর নাড়ী দেখিতে গিয়া ঐ অবস্থা দাঁড়ায়, শরীরাভ্যন্তরে শ্রীনামের প্রচণ্ড আলোড়নে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। তিনি অনিচ্ছুক হইলেও রোগীরা নাছোড়বান্দা, কারণ তিনি সুচিকিৎ-সক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। জনৈক বেশ্যা এক মুসলমানের সঙ্গে নিকা বসিয়াছিল। চিকিৎসার্থ যাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য যেমন স্পর্শ করিলেন অমনি একটা যেন তপ্ত লৌহশলাকা তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল এবং শ্রীনাম প্রবাহ সহসা বন্ধ হইয়া গেল, তিনি মৃতপ্রায় শুষ্ক হইয়া পড়িলেন। কোন অসৎ লোককে স্পর্শ করিলে তাঁহার শরীরে জ্বালা উপস্থিত হইত কিন্তু সৎসঙ্গ করিলে নামানন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। কোন লোকের মুখের দিকে তাকাইলেই তাহার অন্তরের সমস্ত ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন।

ছয় মাসকাল এইভাবে নামামৃত সাগরে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। বাসুদেবঃ সর্ব্বামিতি অবস্থা।

একদা জমিজমা সংক্রান্ত মামলা মিটাইবার জন্য তাঁহাকে ৩০ মাইল দূরে জমিদারী কাছারীতে যাইতে হইল। বাধ্য হইয়া সেখানে আহারাদি করিতে হইল। একই পাকঘরে

এক পার্শ্বে আমিষ ও অন্য পার্শ্বে নিরামিষ রান্নাবান্না হইয়াছিল। তিনি নিরামিষ ভোজন করা সত্ত্বেও অন্তরটা অতি মলিন বোধ করিতে লাগিলেন, নাম যেন বন্ধ হইয়া আসিল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বাণী স্মরণে আসিল,—'বিষয়ীর অন্ন খাইলে শুষ্ক হয় মন। মলিন মনে কৈছে হয় শ্রীকৃষ্ণের ভজন।'

উক্ত ঘটনার বৎসর কয়েক পর অক্ষয় দাদা তাঁহার নিকট আত্মীয় জনৈক পদাবলী কীর্ত্তনীয়ার সঙ্গে এক মহোৎসবে যোগদান করিতে যান। শৈশবে তিনি উঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন কারণ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন মালাতিলকধারী, নিরামিষভোজী, রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সেবক এবং প্রসাদ ছাড়া কিছুই খাইতেন না। একদিন তাঁহার সহিত প্রসাদ পাইতেছিলেন এমন সময় কীর্ত্তনীয়া দুধের বাটিতে চুমুক দিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ অক্ষয় দাদাকে পান করিতে দিলেন। দুগ্ধের উপর তুলসীপত্র ছিল এবং তিনি ইতঃস্তত করিয়া প্রসাদজ্ঞানে সেই উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পান করিলেন। সেইদিন রাত্রে তিনি কীর্ত্তনীয়ার সঙ্গে শয়ন থাকা কালীন এক দুঃস্বপ্ন দেখিলেন যেন এক পরমাসুন্দরী যুবতী উলঙ্গ অবস্থায় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং তিনি কামের উত্তেজনায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। ৪৬ বৎসরের জীবনে তিনি কোনদিন এমনভাবে কামাহত হন নাই; কামরিপুর প্রভাবে তিনি এত অমানুষ হইতে পারেন তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অনুতপ্ত হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জ্ঞাত হইলেন যে কীর্ত্তনীয়া অত্যন্ত চরিত্রহীন, কর্ত্তাভজা বা কিশোরীভজা দলের

একজন সদস্য। গোবিন্দের প্রসাদকে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট করিয়া তাঁহারা তাহাকে মহাপ্রসাদ বা বৈষ্ণব-অধরামৃত জ্ঞানে জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ সকলে পরস্পরের উচ্ছিষ্ট পাইয়া থাকেন।

শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার প্রকাশিত যোগীরাজ কুলদানন্দ পুস্তকের প্রথম সংস্করণ হস্তগত হওয়া মাত্র অক্ষয় দাদা এক আসনে বসিয়া দুই বার ইহা পাঠ করেন এবং শ্রীনাম ও প্রাণায়াম আপনি সজোরে বহুক্ষণ চলিতে থাকে ফলে তিনি ভাববিহ্বল হইয়া পড়েন এবং প্রকাশকের শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। চন্দননগর মহাহোম সম্মেলনে যোগদান করিতে গেলে সেখানে একজন উকিল গুরুভাই তাঁহার সহিত অসৎ ব্যবহার করিলে এবং কেহ কেহ উক্ত পুস্তকের বিপরীত সমালোচনা করিলে তিনি মর্ম্মাহত হন এবং তাঁহার শরীরে অশ্রুকম্পপুলক যুগপৎ উদয় হইয়াছে দেখিয়া সকলে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন।

এইভাবে অক্ষয় দাদা তাঁহার জীবন দৃষ্টান্তে নিজ উত্থান ও পতন সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া আমাদের সাবধান বাণী ও ভরসার বাণী শুনাইয়া প্রকৃত কল্যাণ করিয়াছেন।

——:o:——

শ্রীমৎ কুলদানন্দজীর করুণার বৈশিষ্ট্য

সতীর্থ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া কলেজ হইতে এম, এস, সি পাস করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ" গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া তিনি দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পিতার অনুমতি না হইলে দীক্ষা হইতে পারে না অথচ ডাক্তার পিতা ইহার ঘোর বিরোধী। তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, উপযুক্ত শিক্ষাও পাইয়াছেন, কিন্তু নিজ আত্মার কল্যাণার্থে কেন দীক্ষা পাইবেন না, তিনি সুদীর্ঘ পত্রে শ্রীগুরুচরণে এ সকল কথা সবিস্তারে নিবেদন করেন। চিঠিপত্র লেখার ভার এই অধমের উপর থাকায় প্রত্যুত্তরে আমি শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করিলাম যে, উপযুক্ত ব্যাকুলতা প্রাণে জাগিলে পিতামাতার অনুমতি অবশ্য লাভ করিবেন। চিঠিখানা পড়িয়া তিনি খুব কাঁদিতে থাকেন এবং অন্যমনস্কভাবে চিঠিখানা ফেলিয়া রাখিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া সেই চিঠিখানি লইয়া পড়েন এবং ডাক্তারবাবুকে পড়িতে দেন। পত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া সহসা ডাক্তারবাবুর মত পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তিনি সস্ত্রীক দীক্ষা লইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া

শ্রীশ্রীঠাকুরকে পত্র লিখিলেন। কাজেই দেবেন্দ্র বাবুর অনুমতি পাইবার আর কোন বাধাই রহিল না। তৎপর ১৩৩৬ সালের ৩০শে চৈত্র মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে সকলের দীক্ষা কার্য্য সমাপ্ত হয়।

দেবেন্দ্রের জীবন অতঃপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট রুটিন ধরিয়া কঠোরভাবে সাধনভজনে আত্মনিয়োগ করেন। কাহারও বিরুদ্ধে সামান্য সমালোচনা শুনিলে তিনি অতিমাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন। পরনিন্দা পরচর্চ্চা শুনিলে তিনি কর্ণে অঙ্গুল। দিয়া স্থান ত্যাগ করেন। ক্রমশঃ কানে কম শুনিতে থাকেন এবং পরিণামে বধিরতা তাঁহার সকল উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে। শিক্ষকতা কার্য্যে অভিজ্ঞতা থাকায় সুপরিচিত কেহ কেহ নিজ পুত্রকন্যার শিক্ষাকার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন এবং এইভাবে সামান্য উপার্জ্জনে তাঁহাকে কায়ক্লেশে চলিতে হয়। অসময়ে কেহ কারও নয়। পুত্রেরা শিক্ষিত ও উপার্জ্জনশীল হইয়াও তাঁহার প্রতি উদাসীন। স্ত্রীর সেবা ও সহানুভূতি হইতেও তিনি বঞ্চিত। শ্রীনামই এখন একমাত্র সান্ত্বনা ও সম্বল। সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া শ্রীগুরু তাঁহাকে আপন পানে আকর্ষণ করিতেছিলেন।

কিছু কাল পূর্ব্বের ঘটনা। বহু দিন বেকার অবস্থা। পিতাও বৃদ্ধ এবং উপার্জ্জনে অক্ষম। পিতামাতাকে লইয়া দেবেন্দ্রের জীবন অর্থাভাবে বড়ই কষ্টে কাটে। মাসে ন্যূনকল্পে ৮০।৯০ টাকা না হইলে সকলকে অনশনে মরিতে হইবে।

দেবেন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ একদিন 'যোগিরাজ কুলদানন্দ' পুস্তকে ছকুদাস মালাকারের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণার কথা পড়িয়া দেবেন্দ্রের মনোবল বর্দ্ধিত হয় এবং চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে উন্মনাভাবে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। এক উন্মুক্ত ময়দানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে থাকে এবং ছকুদাসের কথা ভাবিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে থাকে। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ সম্মুখের এক দ্বিতল বাটি হইতে কেহ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে বুঝিয়া দৈবপ্রেরিতভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। একটি বি, এস, সি শ্রেণীর ছাত্র তাহাকে পড়াইবার অনুরোধ জানায় এবং মাসে ৩৫৲ টাকা করিয়া দিবে বলে। এই অর্থে তাহার অভাব মিটিবে না জানিয়াও শ্রীগুরুর কৃপার দান মনে করিয়া দেবেন্দ্র তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সে স্থান ত্যাগ করে। অল্প দূর আসিলে সেই যুবকটি আবার দৌড়াইয়া আসিয়া প্রার্থনা জানায় যে, আই, এস, সি শ্রেণীর ছাত্র তাহার দুটি আত্মীয়কে সে পড়াইতে পারিবে কি না এবং কত টাকা পারিশ্রমিক দিতে হইবে। ৩০ টাকা করিয়া ৬০ টাকা দিলেই হইবে বলায় যুবকটি সম্মতি জানায় এবং পরদিন হইতে কার্য্যে আসিতে প্রার্থনা করে। শ্রীভগবানের অমোঘ আশ্বাস বাণী—'যোগক্ষেম বহাম্যহম্।' অপ্রত্যাশিতভাবে দেবেন্দ্রের সংসারযাত্রার ভার শ্রীগুরু এইভাবে গ্রহণ করায় কৃতজ্ঞচিত্তে সে অকূল কাণ্ডারীর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করে।

পরদিন সকালে দেবেন্দ্রের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। উক্ত আনুকূল্য তাহারই কৃতিত্বগুণে লাভ হইয়াছে অথবা ইহা সত্যই শ্রীগুরুর অদৃশ্য হস্তের কৃপা, তাহা পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিল। কলেজে গিয়া ৬।৭ শত ছাত্রের মধ্যে অনেককে আবেদন জানাইল যে তাহার ২৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে এবং বহু ছাত্রকে সে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ করাইয়া দিয়াছে, তাহার শিক্ষকতা কখনও ব্যর্থ যাইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না বরং নানা অজুহাতে তাহাকে এড়াইয়া গেল। এই উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব দেখিয়া নিজের প্রতি, নিজ কৃতিত্বের প্রতি দেবেন্দ্রের ঘৃণা জন্মিল, নিজ অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ হৃদয়ের নীচ দুরবস্থা বুঝিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রবল ইচ্ছা জাগিল। সহসা শ্রীনামের বেগ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল এবং সে অচিরে সরস সহজ অবস্থা ফিরিয়া পাইল।

——:০:——

মদনমোহন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ

জনৈকা সম্ভ্রান্তবংশীয়া অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী একদিন দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ২০৩।৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ভবনে আসিয়া গোপনে তাঁহার প্রাণের কথা নিবেদন করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। আমি বাতাস করিতেছিলাম, অন্যান্য সকলে ইঙ্গিত পাইয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। যুবতী ইতস্তত করিতে থাকিলে শ্রীগুরু বলিলেন—'ওর সামনে নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলিতে পার।' যুবতী তখন বলিতে থাকিলেন—'আমার বহু আত্মীয়া আপনার শিষ্যা এবং আমারও দীক্ষা নেওয়ার যথেষ্ট আগ্রহ। গোসাঁইজীকেই আমি শিশুকাল থেকে মনে মনে গুরুরূপে বরণ করেছি এবং প্রাণে স্বাভাবিকভাবে প্রার্থনা ওঠে যেন তিনি কৃপা করে আমাকে আশ্রয় দেন। স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় থাকি কিন্তু কখনও রিপুর উত্তেজনা তেমনভাবে অভিভূত করতে পারে না। আপনার এই তপঃপ্রভাবে উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল, অনুপম সুগৌর কান্তি, দেবদেহর মনমাতানো পদ্মগন্ধ, চোখের অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি প্রভৃতি চিন্তা করতে গেলে আমি যেন কেমন হয়ে যাই, জীবন-যৌবন দেহ-মন-প্রাণ সবই যেন নিঃশেষে সমর্পণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। স্থান-

কাল-পাত্র আমার জ্ঞান থাকে না, তাই আমি আপনার কাছে বেশী আসতে ভয় করি। আমি কি পাগল হয়ে যাব? আমাকে রক্ষা করুন, আমার সকল দুর্ব্বলতা দূর করুন।' যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীচরণে পতিত হইল। অল্পক্ষণ পরে মুখ তুলিতেই মহিলাটি লক্ষ্য করিলেন যেন ব্রহ্মচারিজী মমতা-পূর্ণ অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া আছেন। পরে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং যুবতী সচকিত নয়নে দর্শন করিলেন যেন সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি ভগবান্ গোসাঁইজী উপবিষ্ট। লজ্জিতা হইয়া প্রণাম করিলেন এবং মুখ তুলিয়া পুনঃ ব্রহ্ম-চারিজীকেই উপবিষ্ট দেখিলেন। যুবতী নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। চক্ষু ভাল করিয়া রগড়াইয়া মুখ তুলিতেই দেখিলেন অর্দ্ধ অঙ্গ গোস্বামীপ্রভুর এবং অর্দ্ধাঙ্গ ব্রহ্মচারিজীর। পশ্চাদ্ভাগ ব্রহ্মচারিজীর, সম্মুখ ভাগ গোসাঁই-জীর। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বহুক্ষণ এইরূপ বিভিন্ন রূপের মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া মহিলা যেন কোন উপরি শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেবদেহকে সাত বার পরিক্রমা করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে সংজ্ঞাহারাভাবে পড়িয়া রহিলেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বুঝিলেন যেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মস্তকে পদ্মহস্ত বিলেপন করিতেছেন এবং সেই পুণ্য স্পর্শ তাঁহার দেহ ও মনকে চিরতরে শুদ্ধ, পবিত্র ও শান্ত করিয়া দিতেছে।

এই প্রৌঢ়া সতীর্থা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) আজও সে কথা স্মরণ করিয়া চোখের জলে ভাসেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ছলে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে 'পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি, পতিতপাবন শ্রীগুরু ব্রহ্মচারী' বলিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ভাবাবেশে নাচিতে থাকেন।

——:০:——

মহিমা প্রকাশে ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দ

জনৈক সতীর্থ চাকুরী বাকরি ও সংসার ত্যাগ করিয়া কিছু-দিন হইল ধর্ম্মজীবন গঠন ও শ্রীগুরুর সেবার উদ্দেশ্যে পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে বাস করিতেছেন। তিনি যে উচ্চ আদর্শ কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন এখানে যেন ক্রমশঃ তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিতেছেন, বর্ত্তমান পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ্ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। আশ্রম নামধেয় হইলেও এখানে যেন সংসার ও সাংসারিকতার আঁচ তাঁহাকে পীড়া দিতেছে। শ্রীগুরু প্রদত্ত শক্তিযুক্ত নামের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে অবিচল বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকিলেও শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রত্যক্ষ আদেশ ও উপদেশের উপর তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। আশ্রমের সেবা কার্যে থাকিতে থাকিতে প্রারব্ধ শেষ হইয়া আসিলেই সজনতার মধ্যেই নির্জ্জনতা বোধ আসিবে, তখনই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইবে, পাহাড় পর্ব্বতে যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না, শ্রীগুরুর এই ইঙ্গিতে সাময়িকভাবে প্রাণে রেখাপাত করিয়া অন্তরে সামান্য সরসতা উজ্জীবিত করিলেও, অন্তর-রাজ্যে দারুণ সংগ্রাম চলিতেছে, ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া দিবারাত্র অতিকষ্টে অতিবাহিত হইতেছে। শ্রীগুরুর সকরুণ সতর্ক দৃষ্টি

সহানুভূতিপূর্ণ সস্নেহ ব্যবহার, সব ব্যর্থ বোধ হইতেছে। গুরুর প্রতি কোন নিষ্ঠা ভক্তি আসে না, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম কেন জন্মায় না, কেন নির্বিচারে নিজেকে শ্রীচরণে বিলাইয়া দিতে পারেন না, এই চিন্তায় তিনি পাগল প্রায় হইলেন— শুষ্কতা ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল, আত্মহত্যা করিবার সংকল্পে তিনি দৃঢ় হইলেন।

একদিন গভীর রাত্রে আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় অর্দ্ধ তন্দ্রা-যোগে তিনি দেখিলেন যে জনৈকা স্বর্ণবর্ণা, অতিবৃদ্ধা তপস্বিনী হঠাৎ আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহু সজোরে আকর্ষণপূর্ব্বক অতি ত্রস্তপদে এক নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর লতাপুষ্প সুশোভিত, উচ্চ বেদী সমন্বিত, (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মুক্তি প্রাঙ্গণের ন্যায়) সুরম্য পর্ণকুটির এবং সেই বেদীর উপর এক প্রান্তে এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর বৃদ্ধ যোগাসনে সমাসীন। যোগীবরের অতি শুভ্র দীর্ঘ কেশদাম, প্রলম্ব সুশুভ্র গুম্ফ শ্মশ্রু, শ্রীঅঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ রক্তবর্ণ জ্যোতি সন্দর্শনে গুরুভ্রাতাটি বিস্ময় বিমুগ্ধ হইলেন। 'ইনিই ঈশ্বরপুরী' বলিয়া বৃদ্ধা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন। গুরুভ্রাতাটি যন্ত্রচালিতের ন্যায় দণ্ডায়মান অবস্থাতেই প্রগাঢ় যত্নসহকারে মহাত্মার পদযুগল উভয় হস্তে স্পর্শ করিবা মাত্র উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে ও অশ্রুকম্পপুলকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সান্ত্বনদানপূর্ব্বক মহাপুরুষ প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে তিনবার আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন— "গুরুভক্তি হউক।'

ভাগ্যবান গুরুভ্রাতাটির চমক ভাঙ্গিতেই লক্ষ্য করিলেন যে তিনি আসনে উপবিষ্ট আছেন অথচ এই ঘটনায় স্বল্প সময়ে অপূর্ব্বভাবে তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন। গুরু যে একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাহা যেন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছেন, গুরু বাক্যই যে মন্ত্রের মূল এই অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সকল সন্তাপ যুগপৎ তিরোহিত হইয়াছে, নামানন্দে ভরপুর আছেন।

পরবর্ত্তী সুদীর্ঘকাল মধ্যে এই দেবদুর্ল্ভ অবস্থা হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই। শ্রীগুরু যতদিন দেবদেহে বর্ত্তমান ছিলেন ততদিন গোসাঁইজীর—শ্রীধরের মত তিনি অনুগত ভৃত্যের ন্যায় ছায়ারূপে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, শ্রীগুরু সেবায় নিজেকে অবিচারে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। আশ্রমের উচ্চ নীচ যাবতীয় কর্ম্মই তিনি ভগবৎ সেবারূপে নিঃসঙ্কোচে করিয়া আসিতেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হইলেও এই দীর্ঘকাল তিনি আশ্রমে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িত থাকিয়াও ভজনানন্দে রহিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগবৈরাগ্যপূর্ণ আদর্শজীবন আমাদের সকলের অনুকরণীয়।

ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দজীর ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৩৬ সালে মহাহোম সম্মেলন। চন্দননগর ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে বহু শিষ্যভক্ত সমাগত। জনৈক উচ্চশিক্ষিত ত্যাগী শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল দেহ যে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার প্রতি সকলের কর্ত্তব্য বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা করুণ আবেদন জানান। তাঁহার আন্তরিক কথাগুলি অনেকের মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং তাঁহারা চোখের জলে ভাসিতে থাকেন। রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর আহারে বসিয়াছেন, বড়দিদি (মনোরমা শ্রীমাণি) বাতাস করিতে করিতে গুরুভ্রাতাটির ভাষণ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'এই ছেলেটিই ভবিষ্যতে আপনার নাম রাখবে।' শ্রীগুরু বলিলেন,—'পিতামাতার গুরুতর অভিশাপ, ওর পক্ষে এ জীবনে স্থির হওয়া কঠিন।' বড়দিদি হতাশ হইয়া বার বার বলিলেন,—'আর ত' একটিকেও দেখি না।' গম্ভীর স্বরে ঠাকুর বলিলেন,—'দেখো, সত্যনারায়ণ কিছুই বাকী রেখে যাবে না।'

১৯৩৭ সালের প্রথম। পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রম। সতীর্থ সত্যনারায়ণ অল্পদিন হয় শ্রীগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে সকল কাজের ভার দিয়া যেন

নিশ্চিন্ত। আশ্রমস্থ অন্যান্য গুরুভ্রাতারা সত্যনারায়ণের এই প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া যেন মনে মনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিতেছেন। একদিন সত্যনারায়ণ শ্রীগুরুর সঙ্গে তাঁহার শেষ রেজিষ্ট্রীকৃত অর্পণনামা দলিল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখিতভাবে বলিলেন—'কি করবো বল, তোমাদের মত শিক্ষিত ত্যাগবৈরাগ্যসম্পন্ন একটি ছেলেও এতদিন পাই নি কাজেই বিষয়ীদের নিয়েই যা পারি করতে বাধ্য হয়েছি। জানি, এর পর পরস্পর খেয়োখেয়ী করে মরবে, উপযুক্ত লোকের আশ্রমে স্থান হবে না।' সত্যনারায়ণ, রাজেন্দ্র, বসন্ত প্রভৃতির নাম দলিলে নাই বলিয়া শ্রীগুরু আশ্রমস্থ সকলকে ডাকাইয়া ঐ দলিল নাকোচ করিয়া নূতন দলিল করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে সাব্-রেজিষ্ট্রার সন্তোষনাথজীর পরামর্শ মত স্থির হইল যে তিনি ইচ্ছামত নাম দলিলে সংযোজিত করিতে পারিবেন। দেবদেহ অসুস্থ হইয়া পড়ায় শ্রীগুরুর এই ইচ্ছা আইনতঃ কার্য্যকরী হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহার ইচ্ছার মর্য্যাদা না রাখিয়া নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছেন।

আষাঢ় মাসের প্রথম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনা হইয়াছে। সতীর্থ সত্যনারায়ণ একদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান উদ্দেশ্যে বাহির হইলে নীচে রাস্তার ধারে একটি সাধুকে মুমূর্ষু অবস্থায় শয়ান দেখিলেন। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন সত্যনারায়ণকে রোগীর দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং কতকটা নিকটে গেলে যেন শ্রীনাম মুখ হইতে

উচ্চারিত হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে সত্যনারায়ণ নিজেকে সংযত করিয়া সরিয়া পড়িলেন। স্নানতর্পণাদি সারিয়া যখন ফিরিলেন তখন সাধুকে মৃত অবস্থায় দেখিলেন। ভারাক্রান্ত মন লইয়া নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে যখন ত্রিতলে শ্রীগুরুকে প্রণাম করিতে উপস্থিত হইলেন তখন ঠাকুর বলিলেন—'বেচারী আমার আশ্রয়ে এসে প্রাণ রাখলো, তোমরা কেউ তার শেষ সময়ে কানে একটা নাম শোনালে না ?' সত্যনারায়ণ অপ্রতিভের মত সমস্ত কথা নিবেদন করিলে শ্রীগুরু গম্ভীরভাবে বলিলেন—'যখন পরিষ্কার বুঝলে যে একটা উপরিশক্তি ক্রিয়াশীল তখন নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়। মৃত্যুকালে নাম শোনান ত' অবশ্য কর্ত্তব্য। উপযুক্ত আধারের মধ্য দিয়ে গুরুশক্তি এইভাবে কাজ করে। ভবিষ্যতে তোমাকে কত কাজই ত করতে হবে।

পরবর্ত্তীকালে সত্যনারায়ণ সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রম সেবায় ষোল আনা মনপ্রাণ নিয়োগ করিলেও সেখানে তাঁহার স্থান হয় নাই। সে গণ্ডী তাঁহাকে ছাড়িতে হইয়াছে। বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীগুরু তাঁহার মধ্য দিয়া প্রয়োজনীয় বহু কাজ করাইয়া লইতেছেন এবং তিনি তাঁহার মত অযোগ্য আধারে গুরুশক্তির অপূর্ব্ব লীলা সন্দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক বুঝিতেছেন।

—:০:—

সদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীকুলদানন্দজীর নিরাপদ-আশ্রয়

সতীর্থ সন্তোষনাথজী প্রায় সারা জীবন চাকুরী করিয়াও যে আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূল রহস্য নিহিত ছিল তাঁহার শ্রীচরণে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মচারী মহারাজ একটি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—'অফিসের কাজকর্ম্মে অবহেলা করিয়া তুমি যদি সারা দিন সাধনভজনে কাটাও তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট, আর সাধন-ভজন বন্ধ করিয়া যদি সারা দিন কাজকর্ম্মে কাটাও তাহাতে আমি সন্তুষ্ট।' শিষ্যের প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে তাহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চ সম্পদের অধিকারী করাই ছিল এই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা সামর্থী শ্রীগুরুর বিশেষত্ব।

একমাত্র উপযুক্ত পুত্র প্রতিভানাথ কয়েক ঘণ্টার অসুখে মারা গেল কিন্তু সন্তোষনাথজীর মধ্যে কোন শোক দেখা গেল না। তিনি নিজ অন্তরে স্বাভাবিক সন্তোষ রক্ষা করিয়া নিত্যকর্ম্মে ব্রতী রহিলেন। পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে যাইয়া পুত্রের ঔর্ধ্বদেহিক কর্ম্ম সমাপণ করিলেন। হঠাৎ একদিন

সন্ধ্যা বেলায় তাঁহাকে শোকে অতিশয় কাতর দেখা গেল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, মাটিতে লুটাইয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। সতীর্থ সত্যনারায়ণ তাঁহাকে ধরিয়া ছাদে শ্রীগুরু সমীপে উপনীত করিলে তিনি বলিলেন—'কি সন্তোষ! শোকাতীত অবস্থা লাভ করেছো, মহাপুরুষ বনে গেছো, আর ভাবনা কি?' অতি অপ্রতিভভাবে সন্তোষনাথ বলিলেন—'পুত্রবিয়োগে একদিনের জন্যও আমাকে শোক স্পর্শ করে নি, গায়ে কোন আঁচই লাগে নাই, তাই হঠাৎ মনে হল শ্রীগুরু কৃপায় একটা নিরাপদ স্থান লাভ হয়েছে এবং মনে এই কথা ওঠা মাত্র ভিতরটা যেন কাটা ছাগলের মত কেঁপে উঠ্‌ল।' সস্নেহে পৃষ্ঠে শ্রীহস্ত বিলেপন করিতে করিতে শ্রীগুরু সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন—'ঠাকুর কৃপা করে তোমাদের স্নেহাবরণে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, সকল সন্তাপ, সকল মলিনতা থেকে রক্ষা করছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অভিমান এলেই সর্ব্বনাশ।' সন্তোষনাথজী সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

সতীর্থ সত্যনারায়ণকে শ্রীগুরু আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যে এইভাবে মাঝে মাঝে দর্শন ও সঙ্গ করিলে ক্রমশঃ অন্তরে সরসভাব স্থায়ী হইবে, নামানন্দে ভাসিবে। প্রায় তিন বৎসর এইভাবে আসা যাওয়াই সার হইল, শুষ্কতা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জগতের কোন বস্তুতেই যেন কোন রস নাই, দিবারাত্র হা হুতাশে কাটিতেছে, আত্মহত্যা ছাড়া যেন কোন উপায় নাই। শ্রীগুরুচরণে পত্রযোগে সমস্ত অবস্থা

নিবেদন করিয়া শেষ বোঝাপড়া করিবার সঙ্কল্প লইয়া, তিন দিনের অবসর লইয়া সত্যনারায়ণ কটক হইতে পুরী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেবদেহ খুবই অসুস্থ বলিয়া তিন দিনের মধ্যে আলাপ করিবার কোন সুযোগ পাওয়া গেল না। ফিরিয়া আসিবার ঘণ্টা কয়েক পূর্ব্বে সত্যনারায়ণ প্রাণের আবেগে সমস্ত অবস্থা ছোট দাদা শ্রীহেমচন্দ্র বটব্যালের নিকট নিষ্কপটে নিবেদন করিলেন। হেমবাবু গভীর সমবেদনা জানাইলেন এবং সাধনজীবনে এই সঙ্কট অবস্থা আসা যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। সংবাদ লইয়া জানা গেল যে শ্রীগুরু সমস্ত দিন কিছুই সেবা করেন নাই, শরীর খুব কাতর, চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। দর্শন ও আলোচনার সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া সত্যনারায়ণ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন, গুরু ত্যাগের সঙ্কল্পে দৃঢ় হইলেন। হঠাৎ যেন আকাশবাণী হইল—'প্রণাম করে যাও।' প্রাণে গভীর সংগ্রাম চলিতেছে, বাণী শুনিয়া চমকিত হইলেন। অনিচ্ছা সত্বেও দ্বিতলে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেই শ্রীগুরু হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং উপদেশ-চ্ছলে এমন সব কথা বলিতে লাগিলেন যাহা সত্যনারায়ণ ছাড়া জগতে আর কেহই অবগত নয়। স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে শুনিতে সত্যনারায়ণ কাঁদিয়া উঠিলেন এবং শ্রীগুরুচরণে প্রার্থনা করিলেন যেন অসুস্থ শরীরে তিনি বেশী কথা না বলেন। সদ্‌গুরু বলিলেন—'অবস্থায় পড়ে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত অর্জ্জুনকে বিরাট বিশ্বরূপ দেখাতে হয়েছিল। তুমি আজ এই অবস্থায় পড়েছো বলে অনেক কথা বলতে হল। যাও নিশ্চিন্ত

হও। জেনো শিষ্যের প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাসের খবরও গুরুকে রাখতে হয়। সময় না হলে, উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জিত না হলে, কোন অবস্থা দেওয়া চলে না। বেশী ব্যস্ত হ'য়ো না ঠিক সময়ে এখান থেকেই সব লাভ করবে, অন্য কোথাও যেতে হবে না।' সত্যনারায়ণের প্রাণের সমস্ত গ্লানি সমস্ত মলিনতা যেন যুগপৎ মুছিয়া গেল, শরীর চিরশুদ্ধ পবিত্র বোধ করিতে লাগিলেন। তখন হইতে গুরুশিষ্যের মধ্যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, শ্রীগুরু-বাৎসল্যরসে শিষ্য যেন অভিসিঞ্চিত রহিলেন।

ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দজীর
গুরুশক্তি

সতীর্থ সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অল্প দিন হয় বাঁকিপুরে সরকারী চাক্‌রীতে ব্রতী হইয়াছেন। এক দিন জনৈক সহকর্ম্মীর বাসাবাড়ীতে টেবিলের উপর রক্ষিত শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে শেষের দিকে শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের চিত্রখানি দেখিয়া সত্যনারায়ণ বহুক্ষণ সাগ্রহে অপলক নেত্রে তাকাইয়া থাকেন। তাঁহাকে অতি আপন জন, যেন জন্মান্তরের নিবিড় সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হইতেছিল। প্রত্যক্ষভাবে দর্শন লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। সহকর্ম্মী বন্ধুটি তাহা লক্ষ্য করিয়া কৌতুক বোধ করেন এবং ব্রহ্মচারিজীর সহিত তাঁহাদিগের আত্মীয়তার পরিচয় দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ৺কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া সত্যনারায়ণ প্রাণের প্রবল আকর্ষণে, নিজের গতিবিধি গোপন করিয়া, দুই দিনের অবসর লইয়া, পরের রবিবার রাত্রির গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া ১৬ই জানুয়ারী '২২ প্রত্যূষে সোণারপুরা 'ঠাকুরবাড়ী' আশ্রমে উপস্থিত হন। সতীর্থ নারায়ণ মাইতি ও মহেন্দ্র জানা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদের সহিত

আলাপ আলোচনায় সত্যনারায়ণ জানিতে পারেন যে, ব্রহ্মচারিজী নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সাধারণতঃ সাড়ে নয়টার সময় দর্শন দিয়া থাকেন। নিকটেই পতিতপাবনী গঙ্গা প্রবাহিতা। স্নানাদি সারিয়া আসিয়া সত্যনারায়ণ নীচের বৈঠকখানা ঘরে সাধুদর্শনের প্রবল আগ্রহ লইয়া শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

৮টার সময় জনৈক ভদ্রলোককে সরাসরি দ্বিতলে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া সত্যনারায়ণ মহেন্দ্র দাদাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হন যে, তিনি কলিকাতার একজন ধনী ব্যবসায়ী, নাম যতীন্দ্রনাথ পাল, কিছু দিন পূর্ব্বে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। প্রাচীর গাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি প্রতিকৃতি বিলম্বিত ছিল এবং সত্যনারায়ণ সেইদিকে তাকাইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন—সকল স্থানেই বড় লোকেরই গতিবিধি অবারিত, তিনি একজন অপরিচিত নগণ্য ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয় নীচে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারিজীর গুরুগম্ভীর স্বর শ্রুত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'হ্যাঁরে মহেন্দ্র! নীচে কেউ এসেছে কি? আমি যে প্রতীক্ষা করছি, শীঘ্র উপরে আসতে বল।' প্রাণের গোপন কথা অন্তর্য্যামী ঠাকুর জানিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া সত্যনারায়ণের চিত্ত প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল এবং তিনি সসঙ্কোচে উপরে ঠাকুর ঘরে গেলেন।

ব্রহ্মচারীজী যোগাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত, দক্ষিণে সিংহাসনে ভগবান গোঁসাইজীর ও মাতাঠাকুরাণী যোগমায়ার চিত্রবিগ্রহ অপরূপ চন্দনতুলসী ও পুষ্পমাল্যে

সুশোভিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভুবনমোহন সদাশিব নীলকণ্ঠ বেশ, অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসমন্বিত মনোহর অঙ্গঠাম, রজতশুভ্র অনুপম দেহকান্তি সন্দর্শনে সাক্ষাৎ মহাদেব জ্ঞানে সত্যনারায়ণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জোড় করে দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রহ্মচারীজী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কিছুক্ষণ তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সম্মুখের আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পার্শ্বে পশ্চিম দিকে যতীন দাদা উপবিষ্ট রহিলেন। হোম সমাপনান্তে শ্রীগুরু নানা প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কিছুক্ষণ সমাধিমগ্ন রহিলেন এবং পরে ভাববিহ্বল অবস্থায় বিধি ও নিষেধ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। শ্রীনাম বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রবাহের ন্যায় সত্যনারায়ণের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, চকিতে সেই শক্তি নাভিমূলে মৃদু আঘাত দিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধগতিতে ধাবমান হইল, কুলকুণ্ডলিনীর নৃত্যলীলায় সারা দেহে অপূর্ব্ব শিহরণ জাগাইল, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অদ্ভুতভাবে স্পন্দিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম জপ করিবার কৌশল বুঝাইয়া দিতেই সত্যনারায়ণের সকল ধমনীর মধ্যে নামপ্রবাহ একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। অবস্থা কতকটা শান্ত হইলে পর শ্রীগুরু প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিলেন। সেইমত অভ্যাস করিতে গিয়া সত্যনারায়ণ বসা অবস্থাতেই আসন হইতে এক হাত ঊর্দ্ধে সশরীরে উত্থিত হইয়া 'ব্যোম মহাদেব' শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনঃ বসিয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শ্রীগুরু 'স্থির হও' বলিয়া শাসন করিলে শত চেষ্টা করিয়াও সত্যনারায়ণ

নিজেকে সংযত করিতে অক্ষম হইলেন। অকল্পিত নানা ভাবের উদয়, অনাস্বাদিত মধুর নামানন্দ, বিচিত্র দর্শন ও শ্রবণ, শরীরাভ্যন্তরে প্রাণ মাতান নাদধ্বনি, স্বাভাবিকভাবে নানা আসন মুদ্রার প্রকরণ যুগপৎ সত্যনারায়ণকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, বাহ্যজ্ঞান যেন লুপ্ত হইল। তাঁহার দেহ যেন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও লঘু হইয়া বায়ুমণ্ডলে ভাসমান রহিয়া নানাবর্ণের জ্যোতি-র্মণ্ডল মধ্য দিয়া লোক-লোকান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে, চন্দ্র সূর্য্য তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্য দিয়া কোন এক অজানা রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। সব যেন মধুময় মনে হইতেছে। "মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" অবস্থা—বোঝে প্রাণ বোঝে যার!

দু'-আড়াই ঘণ্টা এইভাবে কাটিল। শ্রীগুরু আড় নয়নে সত্যনারায়ণের দিকে তাকাইতে ও মধ্যে মধ্যে 'জয় গুরু' ও 'শ্রীগুরু' উচ্চারণ করিতে থাকিলেন। অত্যাশ্চার্য্য অনুভূতি ও অকল্পিত ভাবরাজ্যে বিহার করিয়া যখন সত্যনারাণয়ের সম্বিৎ ফিরিল তখন তিনি ভয়চকিতের ন্যায় শ্রীগুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'একেই কি দীক্ষা বলে? আমি কিন্তু কোন প্রার্থনা সঙ্কল্প নিয়ে আসিনি, এ বিষয়ে কোন সংস্কারও আমার ছিল না।' শ্রীশ্রীঠাকুর অমিয় মাখান উচ্চ হাস্যসহকারে বলিলেন—'সদ্‌গুরুর সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের যোগ থাকে এবং সময় হলে নিজে না এলেও, গুরুকেই গিয়া দীক্ষা দিয়ে আসতে হয়। তোমার আত্মা প্রার্থী হয়ে ঠিক সময়ে তোমাকে টেনে এনেছে। এই বয়সে সাধন পেলে যথেষ্ট উন্নতি করে যেতে পারবে, জীবন

সার্থক হবে। সামান্য প্রয়োজনে কিছু দিন চাকরী কর, সময়ে ও আপনি খসে যাবে, তখন একমাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই থাকতে পারবে।' যতীন দাদাকে বলিলেন—'বড় চমৎকার আধার। গোঁসাই একে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।'

বিদায়ক্ষণে শ্রীগুরু সত্যনারায়ণের মস্তকে শ্রীহস্তদ্বয় সস্নেহে রক্ষা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সত্যনারায়ণের সমস্ত কার্য্য-কলাপ ভিন্ন গতিতে চলিল। অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মুসলমান প্রভৃতি সকল বন্ধুগণের সঙ্গে তাঁহার প্রিয় হরিণ শিকার করিতে যাওয়া বা তাঁহাদের সহিত পানাহার করা এককালে ত্যাগ করিলেন। বহু দিনের অভ্যাস ব্রাহ্মসমাজ গৃহে বা গীর্জ্জায় সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দেওয়া বন্ধ করিলেন। পারতপক্ষে লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া নির্জ্জনে স্বপাকে সাত্ত্বিক ভোজন শুরু করিলেন। অধিকাংশ অবসর সময় কঠোর সাধন ভজন ও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠে নিয়োগ করিলেন। রাজনীতি চর্চ্চা, যাহা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তাহাও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও নিজের সমস্ত কাজ স্বহস্তে করিয়া সর্ব্বপ্রকারে স্বাবলম্বী হইতে সচেষ্ট রহিলেন।

জনৈক শুভ্রকেশ রক্তমুখ অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী প্রায় প্রতি রাত্রে স্বপ্নের মাধ্যমে দর্শন দিয়া নানা সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দেহ হইতে নিজে স্বতন্ত্র থাকিয়া অপর পরি-দর্শকের মত নিজ মেরুদণ্ড পথে তাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রের মধ্যে পারদ

ওঠানামার ন্যায়, কুলকুণ্ডলিনীর আরোহণ ও অবতরণ ক্রিয়া সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিতেন। নদীতে জলপ্রবাহের ন্যায় শরীরের সকল নাড়ীর মধ্য দিয়া রক্তপ্রবাহ দেখিতে ও মধুর কুলুকুলু ধ্বনি শুনিতে পাইতেন। অভাবিত নানাপ্রকার অনুভূতি, দর্শন ও শ্রবণ স্ফুরিত হইত। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান, পঞ্চকোষ আর ষট্ চক্রের ভেদ-রহস্য হৃদয়ে স্বতঃই উদ্ভাসিত ও প্রত্যক্ষ অনুভূত হইত। শ্রীনাম অবিরাম স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে চলিত এবং তাহার মাদকতা এত অন্যমনস্ক করিয়া দিত যে, সকল কর্ম্মে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইত। বাগানের পুষ্পশোভা, ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। মসজিদ হইতে উত্থিত আজান-ধ্বনি, মন্দিরে ঘড়িঘণ্টার রণন শ্রবণে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া প্রতি লোমকূপ দিয়া যেন শ্রীনাম বিচ্ছুরিত হইত। বিদেশে কেহ তাঁহাকে স্মরণ করিলে বা তাঁহার উদ্দেশ্যে পত্র লিখিতে থাকিলে তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে ও দেখিতে পাইতেন এবং বহু ক্ষেত্রে পত্র প্রাপ্তির পূর্ব্বেই উত্তর লিখিয়া ডাকে দিতেন। কেহ কোন জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত হইলে অন্তর্য্যামীর ন্যায় নিজেই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া দিতেন। কেহ কোন সংবাদ না দিয়া তাঁহার নিকট আসিতেছে বুঝিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন এবং স্বয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া স্বাগত জানাইতেন। বিভিন্ন প্রকৃতির লোক তাঁহার নিকট আসিত এবং তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা তাঁহার নিকট শৃগাল, কুক্কুর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প প্রভৃতি জন্তুর আকারে প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে

সচেতন করিয়া দিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চকোটির সাধকেরা অযাচিতভাবে তাঁহাকে সঙ্গ ও সাধনোপদেশ দানে ধন্য করিতেন। যে-কোন ভাষার যে-কোন পুস্তক তিনি মস্তকে ধারণ করিলেই তাহার ভিতরকার সকল তত্ত্ব তাঁহার বোধগম্য হইত। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে সত্যনারায়ণের এই অত্যদ্ভুৎ উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমাদের ঈর্ষা জাগিত। তাঁহার মুখে এই সকল অলৌকিক গল্প শুনিয়া, তাঁহার ডায়েরী মধ্যে অদ্ভুত অবস্থার বর্ণনা পড়িয়া এবং শ্রীগুরুর উৎসাহপূর্ণ ও সমর্থনব্যঞ্জক পত্রাদি পড়িয়া আমি বিস্ময়াভিভূত হইতাম। অবিশ্বাসী আমি, ঠিকভাবে সকল কথা গ্রহণ করিতে পারিতাম না। সত্যনারায়ণ সংসার ত্যাগ করিয়া আজ বহু কাল নিরুদ্দেশ আছেন, কোন হদিশই পাওয়া যায় না। তাঁহার স্মৃতিতর্পণই আজ একমাত্র সান্ত্বনা ও সম্বল।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

(১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্কল্পসিদ্ধ শিষ্য (অশ্বমেধের ঘোড়া) শ্রীনলিনাক্ষ তা'র সহধর্ম্মিণী, আমাদের কিরণ দিদি, চক্ষুপীড়ায় ক্রমশঃ দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন। বহু ব্যয়বাহুল্য চিকিৎসায়ও কোন ফল হয় নাই। 'অবশেষে শ্রীগুরুর আদেশে তিনি তারকেশ্বরে গিয়া সেখানকার তীর্থগুরুর ব্যবস্থা মত দেবতার প্রসন্নতা লাভের আশায় কঠোরভাবে ধর্ণা দেন। তিন দিন অনিদ্রা অনাহারে কাটিল, দেবতার কোন সাড়া নাই। চতুর্থ রাত্রে তন্দ্রাবস্থায় দেখিলেন, ভগবান্ তারকেশ্বর প্রত্যক্ষভাবে সম্মুখে আবির্ভূত। বলিলেন,—"সদ্‌গুরু আশ্রিত হয়ে তোর এ দুর্ব্বুদ্ধি হল কেন? চাবিকাঠি যে তোর নীলকণ্ঠের হাতে, আমার কিছু করবার সাধ্য নাই।" গৃহে ফিরিয়া শ্রীগুরুকে সমস্ত কথা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন—'সব দিক্ দেখে নেওয়া ভাল রে নইলে আপশোষ থেকে যেত। শত সহস্র শিষ্যের গুরু হয়ে আমি অন্ধ হয়ে পড়ে থাকলে চলতো না, তাই উপযুক্ত আধার বুঝে আমার ভোগটা তোকে দিয়েছি। তোর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যদি কেউ দেখতে পেত তা হলে সে

স্বেচ্ছায় এই ভোগ চেয়ে নিত। নিশ্চিন্ত থাক, তোকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না, এই জন্মেই সব শেষ।'

* * *

(২)

গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলের শিক্ষক সতীর্থ শ্রীঅমৃতলাল বিশ্বাস মহাশয় উচ্চকোটির সাধক ছিলেন বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি নিজ জীবনে শ্রীগুরু কৃপা বহুবার অলৌকিকভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিত-ভাবে জানাইয়াছিলেন। একদিন স্কুল হইতে বাসায় ফিরিতে অধিক রাত্রি হইয়া যায়। ঝড়বৃষ্টির কারণ তাঁহার বাড়ীর পাশের খালে নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। ওপারে যাওয়ার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি এক গৃহস্থের চালায় আশ্রয় লইয়া সাধনে নিমগ্ন হন। কিছুক্ষণ পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন তিনি এই ভাবে বহির্বাটিতে বসিয়া আছেন? চক্ষু খুলিয়া তিনি দেখিলেন যে তিনি নিজের বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া আছেন। কিভাবে বাসায় আসিলেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ রহিলেন।

* * *

(৩)

সতীর্থ সত্যনারায়ণ তখন মজঃফরপুরে চাকুরী করেন। সেখানকার এক স্কুলে গোসাঁই শিষ্য শ্রীশৈলজাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় শিক্ষকতা করিতেন। একদিন শৈলজাবাবুর বাসায় রাত্রে প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ হয়। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অফিসে কাজ ছিল। সত্যনারায়ণ ঐ রাত্রে সাইকেলযোগে বহু দূর আসিয়া এক আম বাগানের ধারে রাস্তা হারাইয়া ফেলেন। নির্জ্জন রাস্তা, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবার উপায় নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চক্ষু বুজিয়া শ্রীগুরুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ নিজ শরীরে একটা তীব্র আলোড়ন বোধ করিলেন এবং চক্ষু খুলিয়া অবাকবিস্ময়ে দেখিলেন যে তিনি সভামণ্ডপের সম্মুখে সাইকেলসহ উপস্থিত।

* * *

(৪)

১৩২৬ সালের কার্ত্তিক মাস। মহাহোমের পর গুরুভ্রাতাটি (নাম প্রকাশে অসম্মত) শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সুকিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীগণেশ শ্রীমাণীর বাসায় অবস্থান করিতেছেন। শ্রীগুরুর অনুমতি লইয়া পিতৃকার্য্য করিবার জন্য গয়াধামে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুর বলিলেন—'গোবিন্দলাল গুফ্‌ত পাণ্ডাজীর বাসায় উঠিয়া তাঁহার ব্যবস্থা মত পিণ্ডাদি কার্য্য করিয়া আকাশ-গঙ্গায় গোসাঁইজীর স্থান ও বুদ্ধগয়া দর্শন করিবে। আমিও শীঘ্র সেখানে যাইতেছি।' গয়া ষ্টেশনে নামিয়া একটি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া রওয়ানা হইলে অনেকগুলি পাণ্ডা চারি দিকে ঘিরিয়া প্রশ্ন করিতে, ভয়ভীতি দেখাইয়া নিজের সঙ্গে যাইতে প্ররোচিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ গাড়ীতে উঠি

বসিল। গুরুভ্রাতাটি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, চক্ষু বুজিয়া শ্রীগুরুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। মনে নানা চিন্তা ও সংশয়ের উদয় হইল। শ্রীগুরুর অনুমতি লইয়া আসিলাম অথচ এই বিড়ম্বনা। গোসাঁইজী ব্রহ্মচর্য্যব্রত, নীলকণ্ঠবেশ ইত্যাদি দিয়া ঠাকুরকে নিজ হাতে গড়িয়াছেন অথচ এতদিন সাধন লইয়া তাঁহার যোগবিভূতি কিছুই দেখিলাম না, আমার এই বিপদে তাঁহার কোন প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি না। ধর্ম্মরাজ্য সবই কি ফাঁকির কারবার, সবই কি স্তাবক ভক্তদের আত্মপ্রচারের কার্য্য? গোসাঁইজীর যোগৈশ্বর্য্যের কথা সবই কি বুজরুগী? গাড়ী চলিতেছে হঠাৎ গুরুভ্রাতাটি বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন যে একটা ঘোড়ার গাড়ী পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইতেছে এবং তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর, মহানন্দ দা, জিতু দা, মহেন্দ্র দাদা রহিয়াছেন। ঠাকুর জোর গলায় বলিলেন—'তুমি সোজা পাণ্ডাজীর বাড়ী যাও, আমরা অন্যত্র উঠ্‌ব, সময়ে দেখা হবে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য দুই খানি গাড়ীও চলিয়া গেল এবং তাহাতে হেমবাবু, কেদারবাবু, নারাণ মাইতি, মৃদুদিদি ও অন্য দুই জনকে অস্পষ্ট-ভাবে দেখিলেন। পাণ্ডার বাটিতে ছড়িদার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিল, গুরুভ্রাতাটি স্বপাক আহারাদি সমাপন করিয়া কোন কোন মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আসিলেন। রাত্রে সুনিদ্রা হইল না। রাত্রি দুইটার সময় তন্দ্রাবস্থায় শ্রীগুরুর আবির্ভাব হইল এবং তিনি বলিতে লাগিলেন—'গোসাঁইজীর শক্তি সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহের লেশ দেখলেও আমার দুঃখের সীমা থাকে না। সন্দেহ নিরসন করবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে তাঁর

শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ছুটে এসেছি। অষ্টসিদ্ধি কিছুই নয়, কি দেখতে চাও? এক কালে বহু স্থানে নিজ সঙ্গীগণসহ প্রকাশ—এটা যোগৈশ্বর্য্য বা সিদ্ধির কাজ নয়, একমাত্র ভগবান্ সদ্‌গুরুই এই লীলা প্রকাশ করিতে পারেন।

দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একেত প্রকাশ হয় আরেত বিলাস॥
একই বিগ্রহ যদি হয় বহু রূপ।
আকারেতে ভেদ নাই একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥
একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন্।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥

আমাদের যেমন দেখলে তা গোসাঁইজীই প্রকাশ করছেন, আমরা কিন্তু স্বকিয়া ষ্ট্রীটেই রয়েছি। অষ্ট বা অষ্টাদশ সিদ্ধি দেখতে চাও পরে দেখো, এখন তোমার গয়াকৃত্য সমাধান কর।" তন্দ্রাবেশ কাটিলে গুরুভ্রাতাটির নবজীবন লাভ হইল, সন্দেহ সংশয় যুগপৎ তিরোহিত বোধ করিলেন। পিণ্ডদানাদি কার্য্য সমাপনান্তে বোধগয়া ও আকাশগঙ্গা দর্শনে গেলেন এবং উভয় স্থানে শ্রীগুরুকেই ধ্যানস্থ দেখিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া গুরুভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে শ্রীগুরু অনেক দিন স্থানান্তরে যান নাই।

(৫)

১৩২৮ সালের কথা। গুরুভ্রাতাটি তখন নোয়াখালির জমিদার বাটিতে চাকুরী করেন। সেখানে গোসাঁই শিষ্য শ্রীভবতোষ দাসগুপ্তও জমিদার বাবুদের আনুকূল্যে কবিরাজী করিতেন। উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব জন্মায়। একদিন হাফেজ বলিয়া জনৈক দালাল ভবতোষবাবুকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া হাতীয়া দ্বীপে বুড়ির চরে ধানের জমি কিনিবার জন্য প্ররোচিত করে। ভবতোষবাবু গুরুভ্রাতাটিকে সঙ্গে লইয়া খেয়াবালাম নৌকা করিয়া, কতক দূর জলকাদায় হাঁটিয়া অতি কষ্টে উত্তর হাতীয়া ঘুরিয়া দক্ষিণ হাতীয়ার প্রান্তস্থিত একটি বাজারে উপস্থিত হন। হাফেজ এই স্থানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবে বলিয়াছিল কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না। এখান হইতে বুড়ীর চর প্রায় ২০।২৫ মাইল রাস্তা, পথ অতীব দুর্গম, কোথাও ভীষণ কাদা, চোরাবালির চটা, কণ্টকাকীর্ণ ঝাড়জঙ্গল। ভদ্রসন্তানেরা এ পথে যাইতে পারে না বলিয়া সকলেই নিষেধ করিল কিন্তু তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না। জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা, উভয়ে বহু কষ্টে বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। একটি চটা পার হইতে গিয়া হঠাৎ ভবতোষবাবুর শরীর যেন বালিতে আটকাইয়া গেল, ক্রমশঃ অর্দ্ধ শরীর প্রোথিত হইল। গুরুভ্রাতাটি উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া একটি চাঁদর তাঁহাকে ধরিতে বলিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হইল, উভয়ে গলদঘর্ম্ম হইয়া হতাশপ্রাণে শ্রীগুরুর স্মরণ করিতে

লাগিলেন। কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না, ভগবান্ গোসাঁইজী ও ঠাকুর স্বয়ং সজোরে চাদরটি আকর্ষণ করিয়া ভবতোষবাবুকে নিরাপদ স্থানে তুলিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। উভয়ে অনেক-ক্ষণ দর্শনানন্দে অভিভূত রহিলেন, শরীরে নববলের সঞ্চার অনুভব করিলেন এবং পুনঃ উৎসাহ সহকারে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। বুড়ীর চরে এবং অতিথি মুসলমানের বহির্বাটিতে আশ্রয় মিলিল। স্থানীয় সকলে নানা অসুবিধা ও লোকসানের কথা বলায় জমিক্রয়ের আশা ত্যাগ করিলেন।

অন্য কোন রাস্তা নাই, নৌকাদিরও কোন ব্যবস্থা নাই, যে পথে আসিয়াছেন সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে ভাবিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। নান্যোপায়, উভয়ে শ্রীগুরুর স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। বহু দূর আসিয়া পথ ভুল হইয়া গেল, ধাপ্পাবাজ হাফেজের কথা স্মরণ করিয়া বিরক্তি বোধ করিলেন। অকূল-কাণ্ডারী ভগবান্ গোসাঁইজীকে ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিতেই তাঁহারা প্রকাশিত হইয়া উভয়কে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। উভয়ে আবিষ্টের মত যন্ত্রচালিতবৎ অগ্রসর হইয়া একটি গভীর, প্রশস্ত, শাখা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। একটি চড়ায় অসংখ্য কুম্ভীরকে রৌদ্রে আরামে শুইয়া থাকিতে দেখিলেন। হঠাৎ সর্ব্ব বৃহৎ কুম্ভীরটি জলে ঝম্প দিয়া পড়িয়া তীরবেগে সাঁতরাইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। গোসাঁইজী ও ঠাকুর লম্ফ দিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং উভয়কে অনুসরণ করিতে বলিলেন। সকলকে লইয়া কুম্ভীরটি জলে ডুবিয়া অতি দ্রুতবেগে সন্তরণ

করিয়া চলিল। উভয়ে এই ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন যে জলের মধ্যে শরীরের কতকাংশ থাকিলেও তাঁহাদের শরীর বা বস্ত্রাদি জলসিক্ত হইল না। ভূতাবিষ্টের মত অভিভূত অবস্থায় বহুক্ষণ এইভাবে কাটিল। অকস্মাৎ কুম্ভীরটি জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, খেয়াঘাটের অনতিদূরে তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন, সম্মুখে নদী তীরে গোসাঁইজী ও ঠাকুর সস্মিতমুখে দণ্ডায়মান। ইঙ্গিত মত উভয়ে খেয়ানৌকায় উঠিয়া বসিলেন, 'চলে যাও কোন ভয় নাই' বলিয়া গোস্বামী প্রভু ও ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। বহুক্ষণ পর আত্মসম্বিৎ ফিরিলে উভয়ে উভয়ের দর্শন, শ্রবণ, অনুভূতি ও অবস্থাদি যে একই প্রকার তাহা উপলব্ধি করিয়া ধন্যবোধ করিলেন। সদ্‌গুরু সর্ব্বদা শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বত্র রক্ষা করেন, জীবন পথ সুনিয়ন্ত্রিত রাখেন, এই বোধে উভয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

* * *

সতীর্থ তুকারাম ভাতকুলিকর একবার মাদ্রাজে ভারত-সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য গিয়াছিলেন। স্ত্রী পুত্রকে ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে রাখিয়া যান। সম্মেলনে জনৈকা সুন্দরী কুমারী সুগায়িকার সহিত আলাপ পরিচয় হয়। কুমারী তুকারামের হারমোনিয়াম বাদ্যে অপূর্ব্ব দক্ষতা, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সুন্দর রূপযৌবন দেখিয়া মুগ্ধ হন, নানাভাবে অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিজ বাটি কলিকাতা লইয়া আসেন। ত্রিতলে একটি মনোরম সুসজ্জিত কক্ষে তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয়। পিতার একমাত্র কন্যা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী।

কয়েক দিনের আলাপ পরিচয়ে কুমারী বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। একদিন অধিক রাত্রে মিলনের প্রবল আগ্রহে কুমারী সমস্ত আলো নির্ব্বাপিত করিয়া উভয়ে শয্যাগ্রহণ করিলে কক্ষের সমস্ত জানালাগুলি যুগপৎ খুলিয়া যায় এবং প্রত্যেকটি বাতায়নে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সস্মিতমুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া উভয়ে অতিমাত্র বিস্মিত ও লজ্জিত হন। অভিভূত অবস্থা কাটিয়া গেলে তুকারাম পুনর্ব্বার সমস্ত জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যাগ্রহণ করিতে গেলে আবার জানালাগুলি হঠাৎ খুলিয়া যায় এবং শ্রীগুরু চকিতে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হন। কুমারী তুকারামের মুখে শ্রীগুরুর সমস্ত পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন এবং সদ্‌গুরু যে অলৌকিকতায় শিষ্যকে পতন হইতে রক্ষা করেন তাহা প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়া অনুতপ্ত তুকারামকে বিদায় দেন। পুরী আসিয়া শ্রীগুরু সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে অতি অনুকম্পার সুরে বলিলেন—'কি তুকারাম, কেমন স্ফূর্ত্তি করলে! শিষ্য অধোবদনে সাশ্রুনেত্রে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

*　　*　　*

পুটিরাম মোদকের দোকানের (১২নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট) ত্রিতলে শ্রীশ্রীঠাকুর দেহরক্ষা করিলে আমরা অনেকে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মৃতবৎ পড়িয়া রহিলাম, যেন আমাদের জীবন-দীপ হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পরে কোন অলৌকিক শক্তিবলে নব প্রাণের সঞ্চার বোধ হইল এবং সকলে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্রতী হইলাম। কিন্তু শ্রীগুরুর স্নেহে আজন্ম

প্রতিপালিতা জনৈকা গুরুভগ্নী মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন এবং উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার পিতামাতা ভ্রাতা স্বামী সন্তান বন্ধু সখা সব একাধারে তিরোহিত হইল। পূর্ণ আত্মসমর্পিত জীবন, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার দেহে যেন কোন আত্মার আবির্ভাব হইল এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রায় ১০।১২ মিনিট কাল ভাষণদান ছলে বলিলেন— 'এই স্থানটি আমার পরম তীর্থ, শ্রীগুরু ভগবান্ নিজ দেবহস্তে এই গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অবশেষে আজ এই স্থানে দেহরক্ষা করিলেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু তিনি কতভাবে কৃপা করিয়া জিতুদাদাকে সামান্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমানে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। কতলোকের এখানে দীক্ষা হইয়াছে, কত ঘটনায় তিনি অলৌকিকভাবে এস্থানে কত জনকে কত শিক্ষা দিয়াছেন, বহু উৎসবাদিতে তিনি অনেকের প্রাণে নবভাবের সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবন-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। আমরা চিরকাল এই স্থানে সমবেত হইয়া তাঁর পুণ্যস্মৃতি চিরভাস্বর করিয়া স্থানটিকে চির জাগ্রত রাখিতে পারি, উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে স্থানটিকে গড়িয়া তুলিতে পারি, আপনাদের উৎসাহ যেন স্তিমিত না হয়, স্মৃতি যেন কদাপি ম্লান না হয়। আপনারা সকলে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করুন, আমি আমার এই সামান্য অলঙ্কার এই উদ্দেশ্যে দিয়া দিলাম।' এই বলিয়া গুরুভগ্নীটি সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

পরবর্ত্তীকালে জিতু দাদা শ্রীগুরুর স্মৃতিরক্ষার্থ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া উকীল গুরুভ্রাতাদ্বয় বঙ্কু দাদা ও চুনী দাদার পরামর্শ মত দলিলের খসড়া করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বাটির দ্বিতলে সাধন-বৈঠক ও উৎসবাদি চিরকাল চলিবে, ২।১ জন গুরুভ্রাতা সেবাপূজার ভার লইয়া বাস করিবেন, আগন্তুক গুরুভ্রাতারা সেখানে প্রসাদ পাইতে পারিবেন ইত্যাদি বিষয় উল্লিখিত ছিল। কেন ঐ দলিল রেজেষ্ট্রীকৃত হয় নাই, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রীপুত্রই বা কেন জিতু দাদার ইচ্ছা কার্য্যকরী করেন নাই, তাহা রহস্যাবৃত।

* * *

গুরুভ্রাতা শ্রীধীরেন্দ্র শঙ্কর দাসগুপ্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাকে প্রায়ই নানা ষ্টেশনে তদন্ত কার্য্যে যাইতে হইত। একবার মাদ্রাজ মেলে কোন স্থানে কার্য্যব্যপদেশে যাইতেছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নিম্ন বাঙ্কে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন আছেন, হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনীতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া লক্ষ্য করিলেন যে তিনি বাঙ্কের নীচে পড়িয়া আছেন এবং উপরের বাঙ্কটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া নিম্ন বাঙ্কের উপর আড়াআড়িভাবে আটকাইয়া তাঁহার দেহকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করিতেছে। উপরে ২।৩ জন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের রক্তাক্ত কলেবর মৃতবৎ শায়িত এবং তাঁহাদের দেহ-নিসৃত রক্তধারা তাঁহার পোষাকাদি সিক্ত করিতেছে। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বহু লোকের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে শুনিতে তিনিও সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। জ্ঞান ফিরিলে পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি সাহায্য ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতে উদ্যত হইলে

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মুখে শ্রীহস্ত দিয়া চাপিয়া নিষেধ করিলেন। ধীরেন দাদা উপলব্ধি করিলেন যেন শ্রীগুরু তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন এবং তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে আরামে ঘুমাইতেছেন। অনেক ক্ষণ পর উদ্ধারকারীর দল আসিয়া খোঁজ খবর করিতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন—'আমি ভালই আছি, আমার দেহে কোন আঘাত লাগে নাই, অপরের রক্তে আমি স্নাত।' ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা পর ছাড়িয়া দিল এবং তিনি অক্ষত দেহে শ্রীগুরুর অসীম কৃপা স্মরণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

* *

১৩২৮ সাল। সতীর্থ শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তখন নোয়াখালি দালালবাজারে জমিদার বাটিতে গৃহশিক্ষক ছিলেন। পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুরিয়া, নানা সমাজে মিশিয়া, কতকটা সাহেবিয়ানাভাবেই চলিতেন। স্থানীয় কংগ্রেসে সাধু চন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব বাগ্মীতা শুনিয়া তাঁহার নিকট বক্তৃতাদান বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় দেশ ও দশের কাজে মনোনিবেশ করেন। সেখানে গুরুভ্রাতা শ্রীমনমোহন পণ্ডিত জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সাত্ত্বিক প্রকৃতি, নিত্য হোম-পূজা-পাঠ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ দাদা ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এক দিন প্রত্যূষে পণ্ডিতজী নিজ নিত্যক্রিয়ায় ব্যাপৃত আছেন এমন সময় নারায়ণ দাদা উপস্থিত হইয়া অবাক বিস্ময়ে বহু ক্ষণ তাঁহার দিকে

তাকাইয়া থাকেন এবং পরে তাঁহার চেহারার বর্ণনা করিয়া যাহা বলেন তাহাতে প্রতীতি হইল যে তিনি মনমোহন দার মধ্যে শ্রীগুরুকেই দর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশচ্ছলে বলিতেন—'বক্তৃতাদি করার প্রয়োজন হয় না, তোমরা যদি নিজেদের সাধনভজন ও নিত্যক্রিয়াদি শাস্ত্রমত করিয়া যাও তাহা হইলে তোমাদের সংস্পর্শে যাহারা আসিবে তাহারাই ধর্ম্মপথে অনুপ্রাণিত হইবে, অজ্ঞাতসারে জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে।' ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং নারায়ণ দাদা তাঁহার নিকট হইতে 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থাদি লইয়া পাঠ করিয়া, স্বপ্নের মধ্যে নানা দর্শনাদি ও উপদেশ লাভ করিয়া শ্রীগুরুর সাক্ষাত দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। মাঘ মাসে কলিকাতা আসিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন।

* * *

শ্রীশ্রীঠাকুর ঝামাপুকুরে সতীর্থ ক্ষিতীশ বাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছেন, শরীর কালাজ্বরে শীর্ণ ও কাতর। ডাক্তারদের পরামর্শ মত কিছুকালের জন্য পদ্মা নদীতে নৌকাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাঃ হরিশ সেন ও গুরু-ভাই-ভগ্নী অনেকে সঙ্গে যাইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। গুরুভ্রাতা বীরেশ্বর শেঠও সস্ত্রীক আসিয়া হাজির। তাঁহার জলাতঙ্ক রোগ আছে এবং তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইতে হইবে আশঙ্কায় ব্যবস্থাপক মহানন্দ দাদা তাঁহাকে সঙ্গে লইতে কোনমতেই রাজী হইলেন না। সুযোগ্যা সেবিকা গুরুগতপ্রাণা পদ্ম দিদি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন,

'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' অবস্থা। বীরেশ্বর দাদা স্ত্রীকে শ্রীগুরুর সেবায় থাকিতে আদেশ দিয়া নিজে ব্যথিত চিত্তে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মনপ্রাণ অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রাত্রে স্বপ্নমধ্যে শ্রীগুরু আসিয়া নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন, শেঠজীর প্রাণের ব্যথা কতকটা প্রশমিত হইল।

শ্রীগুরু দলবলসহ ট্রেণে গোয়ালন্দ গিয়া ৪ খানি বোটে উঠিয়া পদ্মা নদীতে পড়িলেন। নদী বক্ষে প্রায় দুই মাস নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া কাটাইলেন কিন্তু স্বাস্থ্যের তেমন উন্নতি দেখা গেল না। পূর্ব্ববঙ্গের ভীষণ ঝড়বৃষ্টি, দুর্দ্ধর্ষ চোর ডাকাত, দুই জনের কঠিন বসন্ত রোগ, এক জনের কলেরা প্রভৃতি ঘটনায় নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইল এবং প্রত্যেক ঘটনায় শ্রীগুরুর অলৌকিক প্রভাবে বা ব্যবস্থায় সহজে বিপন্মুক্ত হইয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বর কিন্তু অল্পবিস্তর ওঠানামা করিতেছে। এদিকে বার বৎসর পর বুদ্ধ অষ্টমী যোগের সমাবেশ হইল এবং লাঙ্গলবন্দ তীর্থে স্নানের জন্য সহস্র সহস্র ধর্ম্মার্থীর সমাগম হইতে লাগিল। শেঠজীর প্রাণও অলৌকিক-ভাবে শ্রীগুরুচরণে আকৃষ্ট হইল এবং তিনি রওয়ানা হইয়া ঠিক স্নানের সময় ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীগুরু জ্বর গায়ে স্নান করিলেন এবং শেঠজীকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া, স্কন্ধে দেবহস্ত স্থাপন করিয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ডুব দেওয়াইলেন। বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হইল এবং শেঠজী সঙ্গে করিয়া যে সকল ফল ও মিষ্টি আনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা সকলকে পরমানন্দে আপ্যায়িত করিলেন। স্নানের পর হইতেই

শ্রীশ্রীঠাকুর সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং দিন কয়েক পরেই কলিকাতায় ফিরিলেন।

* * *

আমাদের ছোট দাদা, গুরুভ্রাতা হেমচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় পুরী 'ঠাকুরবাড়ী' আশ্রমের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বহু কাল সেখানে বাস করিতেছেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ সাধননিষ্ঠা, নামানন্দে মগ্ন অবস্থা সন্দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইতাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে আশ্রমের ঋষি বলিয়া অভিহিত করিতেন। একদিন ছাদের উপর আমরা শ্রীগুরু-সঙ্গে উপবিষ্ট, এমন সময় বড়দিদি (মনোরমা শ্রীমাণী) কতকগুলি উৎকৃষ্ট ফল আনিয়া শ্রীগুরুর সেবার জন্য তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর কতকগুলি আমাদের খাইতে দিলেন। ছোট দাদা সখ্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একটি অর্দ্ধভুক্ত ফল অতি সুমিষ্ট বুঝিয়া শ্রীগুরুর মুখে পুরিয়া দিলেন, ঠাকুরও তাঁহার ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সানন্দে তাহা খাইয়া ফেলিলেন এবং মিষ্টতার প্রশংসা করিলেন। আত্মচেতনা ফিরিলে ছোট দাদা তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জিত বোধ করিলেও ভাবগ্রাহী ভগবান শ্রীগুরু কোন অপরাধ লইলেন না।

* * *

শ্রীশ্রীঠাকুর বহু ভক্তবৃন্দসহ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুরে অবস্থান করিতেছেন। উকীল শ্রীবঙ্কুবিহারী মল্লিক চৌধুরী মহাশয় সপরিবারে ৺কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীগুরু দর্শন করিয়া আসিবেন সঙ্কল্প করিয়া নিজে বাগানে গিয়া অতি

উৎকৃষ্ট সুবৃহৎ পেয়ারা বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিলেন। মধুপুর ষ্টেশনে ট্রেণ পহুঁছাইলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার তেমন ইচ্ছা হইল না, ইতস্ততঃ করিতে করিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শ্রীগুরুর সেবার জন্য ফল আনিয়া তাহা সার্থক হইল না বলিয়া মনে তীব্র অনুশোচনা আসিল, চোখের জলে প্রার্থনা করিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে জিতু দার সহিত দেখা, তিনি ঠাকুরের নির্দ্দেশমত ফল লইবার জন্য আসিয়াছেন। তৎপূর্ব্ব দিন শ্রীগুরু কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে 'বঙ্কু বৃথা মধুপুরে গেলে কষ্ট পাবে।' অবোধ আমরা, বুঝিয়াও বুঝি না যে শ্রীগুরু সকল অবস্থায় আমাদের পথ সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, হাতে ধরিয়া চালাইতেছেন।

* * *

শ্রীশ্রীঠাকুর দলবলসহ ৺কাশী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, পাটনায় এ অধমকে তারযোগে নির্দ্দেশ দিয়াছেন ষ্টেশনে চা প্রস্তুত রাখিবার জন্য। গঙ্গাজলে ষ্টোভ ইত্যাদি পবিত্রভাবে ধুইয়া মুছিয়া আমি ঠিক সময়ে খালি পায়ে পাটনা ষ্টেশনে আসিয়া একটি নির্জ্জন স্থান পরিষ্কার করিয়া গরম জল প্রস্তুত রাখিলাম। পূর্ব্ব ষ্টেশন দানাপুর হইতে ট্রেন ছাড়িবার সংবাদ পাইয়াই অতি সন্তর্পণে শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে পরম পবিত্রভাবে চা প্রস্তুত করিলাম এবং অন্যান্য প্রচুর খাদ্যবস্তু ও মিষ্টান্নাদি লইয়া গাড়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহকর্ম্মী অনেকে মহাপুরুষ দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। আমার চাকরটি আমাকে কখনও খালি পায়ে

থাকিতে দেখে নাই এবং আমার কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া আমার চটিজুতা জোড়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়াছে। গাড়ী আসিয়া পড়িতেই আমি অন্যমনস্কভাবে চটি পায়ে দিয়া চা ও খাবারাদি লইয়া শ্রীগুরু সমীপে উপস্থিত হইলাম। গরম চা ও উপাদেয় টাট্‌কা খাদ্যবস্তু দেখিয়া ঠাকুর পরম প্রীত হইলেন, সকলকে ভাগ করিয়া দিয়া নিজে পরিতোষসহকারে চা সেবা করিলেন। আমরা সকলে প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলাম। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভাববিহ্বলতা কতকটা কাটিলে লক্ষ্য করিলাম যে আমার পায়ে জুতা। এত পবিত্রভাবে সমস্ত কাজ করিয়াও অবশেষে এই অপরাধ করিয়া বসিয়াছি! অনুতপ্ত হৃদয়ে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বাসায় ফিরিলাম। রাত্রে নিদ্রা নাই, সকল অপরাধের কথা লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। শেষ রাত্রে শ্রীগুরু প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইয়া 'কোন অপরাধ হয় নাই' বলিয়া মস্তকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকল কালিমা মুছিয়া গেল, ঘুম ভাঙ্গিলে সকল কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলাম। পত্রোত্তরে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ কথাই লিখিলেন 'কোন অপরাধ হয় নাই।' জয় গুরু :

সাধনে নিয়মানুবর্ত্তিতা

শ্রীশ্রীঠাকুর চন্দননগর ঠাকুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বহু শিষ্য-শিষ্যা সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করিয়াও তাঁহার পুণ্য সঙ্গলাভে সচেষ্ট। সকালের ট্রেনে অনেকে নিজ নিজ কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য কলিকাতা যান আবার রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে রান্না করিয়া তখন সেবায় বসেন, সকলে পরে প্রসাদ পাইয়া কিছুক্ষণ শ্রীগুরুসঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কাটান। অধিক রাত্রে সামান্য ২।৩ ঘণ্টার জন্য সকলে বিশ্রাম করেন। ঠাকুর শৌচান্তে রাত্রি তিনটায় হোম করেন, তখন সকলে সমবেতভাবে শ্রীগুরুসঙ্গে প্রাণায়াম, নাম ও কীর্ত্তনভজনে সকাল পর্য্যন্ত কাটান। উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবেও কাহার শরীরে কোন প্রকার ক্লান্তি বা গ্লানি নাই, শ্রীগুরুসঙ্গ প্রভাবে সকলে পরমানন্দে নামানন্দে দিনের পর দিন কাটাইতে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ ছিল শিষ্যশিষ্যা প্রত্যেককে সংসারের সমস্ত দিক্ বজায় রাখিয়া দিনরাত্রে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা আসনে বসিয়া সাধন অভ্যাস করিতে হইবে। শিশু গৌরাঙ্গ তা কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত। শিশুর মাতা কিরণ দিদি রান্নাবান্

ও সাংসারিক নানা কাজে সমস্ত দিন অতিমাত্র ব্যস্ত থাকেন, এদিকে শিশুকে লইয়া সমস্ত রাত্রি প্রায় জাগিয়াই কাটাইতে হয়। সকলে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন যে তাঁহাকে এই অবস্থায় আর আসনে বসিয়া তিন ঘণ্টা সাধন করিতে হইবে না কারণ শ্রীগুরু তাঁহার বিব্রত অবস্থা সবই বুঝিতেছেন। সকলের কথামত কিরণ দিদি সেদিন মাত্র এক ঘণ্টা সাধনে বসিয়াছেন। রাত্রে আহার করিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন ঠিকমত তিন ঘণ্টা সাধনে বসা হইয়াছে কি না। কিরণ দিদি চুপ করিয়া আছেন, অন্যান্য সকলে তাঁহার অসুবিধার কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীগুরু বলিলেন—'তা ত বটেই, আমার চেয়ে তোমাদের দরদ বেশী দেখ্‌ছি। অসুখ বিসুখে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে, বিবাহ উৎসবাদিতে রাত কাটাতে পারবে আর সাধনভজনের বেলাতেই অবহেলা। এ আমি সহ্য করবো না।' এই বলিয়া ঠাকুর সমস্ত আহার্য্য বস্তু ঢাকিয়া রাখিলেন। কিরণ দিদি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আসনে দুই ঘণ্টা বসিয়া আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে শ্রীগুরু অধিক রাত্রে সেবা করিলেন।

সাধনে নিয়মানুবর্ত্তিতা

শ্রীশ্রীঠাকুর চন্দননগর ঠাকুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বহু শিষ্য-শিষ্যা সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করিয়াও তাঁহার পুণ্য সঙ্গলাভে সচেষ্ট। সকালের ট্রেনে অনেকে নিজ নিজ কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য কলিকাতা যান আবার রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে রান্না করিয়া তখন সেবায় বসেন, সকলে পরে প্রসাদ পাইয়া কিছুক্ষণ শ্রীগুরুসঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কাটান। অধিক রাত্রে সামান্য ২।৩ ঘণ্টার জন্য সকলে বিশ্রাম করেন। ঠাকুর শৌচান্তে রাত্রি তিনটায় হোম করেন, তখন সকলে সমবেতভাবে শ্রীগুরুসঙ্গে প্রাণায়াম, নাম ও কীর্ত্তনভজনে সকাল পর্য্যন্ত কাটান। উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবেও কাহার শরীরে কোন প্রকার ক্লান্তি বা গ্লানি নাই, শ্রীগুরুসঙ্গ প্রভাবে সকলে পরমানন্দে নামানন্দে দিনের পর দিন কাটাইতে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ ছিল শিষ্যশিষ্যা প্রত্যেককে সংসারের সমস্ত দিক্ বজায় রাখিয়া দিনরাত্রে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা আসনে বসিয়া সাধন অভ্যাস করিতে হইবে। শিশু গৌরাঙ্গ তা কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত। শিশুর মাতা কিরণ দিদি রান্নাবান্না

ও সাংসারিক নানা কাজে সমস্ত দিন অতিমাত্র ব্যস্ত থাকেন, এদিকে শিশুকে লইয়া সমস্ত রাত্রি প্রায় জাগিয়াই কাটাইতে হয়। সকলে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন যে তাঁহাকে এই অবস্থায় আর আসনে বসিয়া তিন ঘণ্টা সাধন করিতে হইবে না কারণ শ্রীগুরু তাঁহার বিব্রত অবস্থা সবই বুঝিতেছেন। সকলের কথামত কিরণ দিদি সেদিন মাত্র এক ঘণ্টা সাধনে বসিয়াছেন। রাত্রে আহার করিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন ঠিকমত তিন ঘণ্টা সাধনে বসা হইয়াছে কি না। কিরণ দিদি চুপ করিয়া আছেন, অন্যান্য সকলে তাঁহার অসুবিধার কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীগুরু বলিলেন—'তা ত বটেই, আমার চেয়ে তোমাদের দরদ বেশী দেখ্ছি। অসুখ বিসুখে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে, বিবাহ উৎসবাদিতে রাত কাটাতে পারবে আর সাধনভজনের বেলাতেই অবহেলা। এ আমি সহ্য করবো না।' এই বলিয়া ঠাকুর সমস্ত আহার্য্য বস্তু ঢাকিয়া রাখিলেন। কিরণ দিদি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আসনে দুই ঘণ্টা বসিয়া আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে শ্রীগুরু অধিক রাত্রে সেবা করিলেন।

প্রাতঃস্মরণীয়া আমাদের বড় দিদি

১৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট ভবনের আমাদের বড় দিদি শ্রীযুক্তা মনোরমা শ্রীমাণী। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ কিন্তু আনুকূল্য অভাবে কোন সক্রিয় পথ অবলম্বন করিতে পারেন নাই। অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে, স্বামী ঘোর মদ্যপায়ী, সর্ব্ব বিষয়ই প্রতিকূল, কাজেই বড়ই মনঃকষ্টে দিন কাটে, প্রাণের ব্যথা নীরবে চোখের জলে অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করেন। একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, প্রাণসংশয় অবস্থা, ডাক্তারেরা জবাব দিয়াছেন। হঠাৎ মধ্যরাত্রে জনৈক জটাজুট-ধারী, সুদর্শন সন্ন্যাসী আসিয়া হাতে তিনটি ঔষধের বড়ি দিয়া নিত্য প্রাতে জলসহ সেবন করিতে বলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর হাতে বড়ি তিনটি দেখিয়া অবাক হইলেন এবং ভগবৎ প্রদত্ত বুঝিয়া অতি ভক্তিভরে তিন দিন প্রাতে সেবন করিলেন। শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল।

১৩১৯ সাল। পিত্রালয়ের জন কয়েক আত্মীয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে বরাহনগরে মণি মল্লিকের বাগান বাড়ীতে এক তপঃসিদ্ধ যুবক ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। পরদানশীন কুলবধূ কোথাও স্বাধীনভাবে যাওয়া চলে না, বাহির হইতে পাল্কীর

প্রয়োজন। দেবর গণেশ শ্রীমাণীকে প্রাণের কথা নিবেদন করিলে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সঙ্গে করিয়া সাধু-দর্শনে লইয়া গেলেন। সুপ্রসন্ন ভাগ্য, বড় দিদি অবাক বিস্ময়ে দেখিলেন যে ইনিই তাঁর পুনর্জ্জীবনদাতা স্বপ্নদৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী। কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করিলেন, দেহ-মন-প্রাণ সবই যেন নিঃশেষে শ্রীচরণে বিকাইয়া দিলেন। প্রসন্নভাবে শ্রীগুরু বলিলেন—'ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই, স্বামীর অনুমতি পাইলে দীক্ষা হইবে। সদ্‌গুরুর সঙ্গে শুধু ইহজন্মের নয়, জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ, তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে।' দেবর গণেশ বউদিদির ব্যাকুলতা দেখিয়া সুকৌশলে দাদার অনুমতি লইলেন এবং বড় দিদি সুদিনের আকুল প্রতীক্ষায় রহিলেন। সংবাদ আসিল শ্রীশ্রীঠাকুর ছকুখানসামা লেনে মেসবাড়ীতে কঠিন পেটের অসুখে শয্যাশায়ী। বড় দিদি মান লজ্জা ভুলিয়া দেবরকে সঙ্গে লইয়া পাল্‌কীতে করিয়া সেখানে উপস্থিত। ঠাকুর ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সেবা করিবার কেহ নাই, অবস্থা প্রতিকূল বুঝিয়াও বড় দিদি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাটিতে লইয়া আসিলেন। বড় দিদির সেবাযত্নে ও উপযুক্ত চিকিৎসায় শ্রীগুরু সুস্থ হইয়া উঠিলেন। বড় দিদি দীক্ষালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। তার পর গণেশ শ্রীমাণী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধন পাইলেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মাঝে মাঝে সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া উঠিতে হইত। তাঁহার উপস্থিতি কালে স্থানটি উৎসব ও কীর্ত্তনানন্দে মুখর থাকিত। ক্রমশঃ বহু ভাগ্যবানের দীক্ষা হয় এবং তাঁহারা

এখানে অবাধে শ্রীগুরুসঙ্গ ও উপদেশাদি লাভের সুযোগ পান। উপেন্দ্র শ্রামাণীরও মতিগতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইল এবং তিনিও বড় দিদির সুকৃতিবলে দীক্ষালাভ করিলেন। অবশেষে এই দম্পতী প্রবল বৈরাগ্যভরে পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রম সেবায় স্থায়ীভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন

শ্রীশ্রীঠাকুর নীলকণ্ঠরূপে অনেকের দুর্ব্বিনীত জীবনের হলাহল পান করিয়া নানা জাতির ও নানা প্রকৃতির শিষ্যকে আশ্রমবাসের সুযোগ দিলেন, বাঘে গরুতে যেন অহিংসভাবে এক সঙ্গে থাকিয়া আশ্রম সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বড়দিদি ক্রমশঃ তাঁহার যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া আশ্রমের প্রধানা গৃহিণী ও কর্ত্রীরূপে সকলের সকল দিক্ সামঞ্জস্য করিয়া সুপরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহার, ধরিত্রীসম সহনশক্তি, অপূর্ব্ব সেবা-দক্ষতা, অতুলনীয় গুরুনিষ্ঠা, বাৎসল্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি দর্শনে সকলের মস্তক সম্ভ্রমে নত হইত। তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ সেবাযত্নে সকলে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ গৃহ অপেক্ষা আশ্রবাসই শ্রেয় মনে করিতেন। শ্রীগুরুর লীলাসহচররূপে স্ত্রী-পুরুষ অনেকে আশ্রম সেবায় জীবনপাত করেন। শ্রীগুরুর অন্তর্দ্ধানের পরেও তাঁহারা অনেকে পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ সেবাকার্য্যে রত থাকেন।

সেবকের অভাবে এ অধমকে কিছুদিন ৺মহাবিষ্ণুচক্র (ত্রিবিগ্রহ) ও শ্রীগুরুর সমাধির (নর্ম্মদেশ্বর) সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল এবং বড় দিদির সস্নেহ সাহায্য সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছিল। সেবায়

ব্রতী থাকাকালে শ্রীগুরুর প্রত্যক্ষ কৃপা ও দর্শনাদি তাঁহার আন্তরিকতাগুণেই লাভ হইয়াছিল এবং আমি চিরকৃতজ্ঞ ছিলাম। তিনি আমাকে নিজ সন্তানের মতই দেখিতেন। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা দোষে সেবাপূজা ও ভোগরাগ ব্যাপারে যে সমস্ত দোষত্রুটী ও পক্ষপাতিত্ব ছিল তাহা শ্রীগুরু এ অধমের মাধ্যমে সংশোধিত করিয়া লইলেন।

এইভাবে বড় দিদি সারাজীবন আশ্রম সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ক্রমশঃ স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলেন। শেষ কয়েক বৎসর ডাক্তারেরা তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অবাক বিস্ময়ে বলিতেন যে বড় দিদির বাঁচিয়া থাকাটাই একটা অলৌকিক ব্যাপার। শ্রীগুরুর অলক্ষ্য শক্তিগুণে সকল অসম্ভবই সম্ভব ছিল, বড় দিদি এই অবস্থাতেও সমুদ্র-স্নান, ৺জগন্নাথ দর্শন প্রভৃতি অবাধেই করিতেন। ঠাকুর তাঁহার সমস্ত প্রারব্ধ এই ভাবে শেষ করিয়া লইলেন কারণ তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, 'এ জন্মেই তোর সব শেষ।' কোন এক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীমাণী দম্পতী আমার ভুবনেশ্বর আশ্রম সদ্‌গুরু নিবাসে আসেন। দিন কয়েক পরে আমি একদিন কলিকাতায় শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সাধন-সঙ্ঘ ভবনে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করিবার কালে, অবিলম্বে ভুবনেশ্বর চলিয়া যাইবার নির্দ্দেশ পাই। মাদ্রাজ মেলে রওয়ানা হইয়া আমি গভীর রাত্রে সেখানে উপস্থিত হই। ভোর বেলা বড় দিদিকে স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট গিয়া বসি এবং তিনি প্রায় এক ঘণ্টা কাল নিজ জীবনের গুহ্য কথা নিষ্কপটে ব্যক্ত করেন। শিষ্য সঙ্গে শ্রীগুরুর

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বহু লীলার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হই এবং মনের বল বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এই ভাবিয়া যে আমরা স্বয়ং নীলকণ্ঠ সদাশিব সদ্‌গুরু আশ্রয় লাভে ধন্য হইয়াছি। অবশেষে বড় দিদি বলিলেন যে তাঁহার কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, শ্রীগুরু তাঁহাকে নিজ প্রয়োজনে লইয়া যাইবার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

বড় দিদি শৌচে গেলেন এবং অনেকক্ষণ আসিতেছেন না দেখিয়া আমি ঝিকে অনুসন্ধান করিতে বলি। ঝি বলিল, তিনি পায়খানায় বসিয়া বড়ই দুর্ব্বল বোধ করিতেছেন, উঠিবার যেন শক্তি নাই। আমিও আশ্রম সেবক পহলী বেহারা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বাগানে একটি পুষ্পিত বৃক্ষতলে শোওয়াইয়া দিলাম। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ দেখিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা অধ্যাপক সুরেশ গুহকে ঠাকুরবাড়ী হইতে তাঁহার হোমিওপ্যাথি ঔষধাদিসহ আসিতে সংবাদ দিলাম এবং বড় দাদা সরকারী ডাক্তারকে ডাকিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বড় দিদি বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি পশ্চাদ্ভাগে একটি বড় বালিশ দিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলাম। তাঁহার মুখমণ্ডল স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত, দেহে দিব্য কান্তি প্রস্ফুটিত, নামানন্দে শরীরে শিহরণ হইতেছে। হঠাৎ তিনি সম্মুখে যেন কাহাকে দর্শন করিয়া আনন্দ আবেগে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইল। মাতৃবিয়োগ ব্যথায় অভিভূত হইলাম। কোন প্রয়োজনে

ঠাকুর টানিয়া আনিয়াছেন বুঝিয়া ধন্যবোধ করিলাম।

বাগানের প্রচুর ফুল সংগ্রহ করিয়া চন্দন ও পুষ্পমাল্যে পুণ্যবতার দেহকে সুসজ্জিত করা হইল। সতীসাধ্বীর তিরোভাব সংবাদ পাইয়া আমার বহু বন্ধুবান্ধব সমবেত হইলেন এবং কীর্ত্তনানন্দে সমারোহে সতীলক্ষ্মীর দেহকে শ্মশানে আনিলেন। চিতাশয্যায় শায়িত মুখখানি যেন অমিয়মাখা অতি সুন্দর মনে হইল। এক পসলা বৃষ্টি হইয়া দেহটিকে স্নাত করিল। অতি অল্প সময়ে চিতাগ্নি কৃপাশ্রিত দেহকে ভস্মীভূত করিল। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া শ্রীভগবানের অনন্ত করুণাধারা বর্ষিত হইয়া চিতাস্থান ধৌত করিয়া দিল। জয় মা আনন্দময়ী !!!

——:০:——

শ্রীগুরু কৃপা ধন্য জীবন

সতীর্থ প্রকাশচন্দ্র ঘোষ উদার-হৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ, পরহিতব্রতী। পুরুলিয়ায় গালার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন কিন্তু যত্র আয় তত্র ব্যয়। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় অভিমানভরে চাকুরী ত্যাগ করেন। হাতে টাকাকড়ি যাহা ছিল তাহা দ্বারা কিছু দিন বসিয়া চলিল, শেষে অর্দ্ধাসন, অনশন। আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট, কাহারও নিকট হাত পাতিতেন না, মাথা নত করিবেন না। কপাট বন্ধ করিয়া তিন দিন বসিয়া শ্রীনাম স্মরণ করিতে লাগিলেন, আহার অভাবে শরীর এলাইয়া পড়িল হঠাৎ কেহ বাহিরে কপাটে ধাক্কা দিল। অতি কষ্টে কপাট খুলিয়া দেখেন গোসাঁই শিষ্য শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় উপর হইতে ইঙ্গিত পাইয়া, সাহায্য করিতে উপস্থিত।

বিবাহের কিছু দিন পর প্রকাশ দাদা বাটা কোম্পানীতে চাকুরী পান। কুলি সংগ্রের জন্য নানা স্থানে যাইতে হয়। একবার বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে যান। রাত্রে তাঁহাকে হত্যা করিয়া অর্থাপহরণ করিবে বলিয়া কয়েক জন দুর্বৃত্ত ষড়যন্ত্র করে। এবং বাহির হইতে কপাট জানালা বন্ধ করিয়া

রাখে। হঠাৎ একটি ভাঙ্গা জানালা-পথে শ্রীগুরুর আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাইয়া, জানালার গরাদে নিজের পরিধেয় কাপড় বাঁধিয়া তাহা ধরিয়া নীচে নামিয়া পলায়ন করে। দুর্বৃত্তেরা বুঝিতে পারিয়া লাঠিসোঁটা ও মশাল জ্বালাইয়া চারিদিকে খুঁজিতে থাকে। নিকটে আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি পার্শ্বের কেয়াবনে লুকাইয়া পড়েন এবং পরে শ্রীগুরুর ইঙ্গিতে নানা বনবাদার ও নালাডোবা পার হইয়া অতি কষ্টে হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া প্রাণ বাঁচান।

একবার খুলনা হইতে ছয় মাইল দূরে পদব্রজে নিজ বাটিতে যাইতেছেন। গভীর রাত্রি, পিছনে যেন শত শত অশ্বের পদধ্বনি শুনিলেন। দাঁড়াইলেই শব্দ বন্ধ থাকে, চলিলেই আবার শব্দ শোনা যায়, যেন নিকটে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সম্মুখে দাবানল দেখিতে পাইয়া ভীত শঙ্কিত হইলেন। যতই আগাইয়া যান দাবানল ততই দূরে সরিয়া যায়। আতঙ্কে শ্রীনাম বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে, হাত পা কম্পিত হইয়া যেন অবশ হইয়া পড়িল। আশ্চর্য্যভাবে জনৈক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাম স্মরণে আসিল। ভয়ভাবনা সব দূরে গেল, রাত্রি ৩টায় নির্ব্বিঘ্নে বাড়ীতে পৌঁছাইলেন।

হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রকাশ দাদা প্রায় আট বৎসর কাল চিকিৎসাদিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। রাত্রে ঘুম নাই, কাসিতে কাসিতে প্রাণান্ত অবস্থা। কেহ কেহ বলে, যক্ষ্মারোগ হইয়াছে। রাঁচিতে সহোদর গুরু-ভ্রাতা সুরেশ ঘোষের নিকট বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সস্ত্রীক গমন

করেন। সেখানে ঢাকার এক বিখ্যাত সাধু আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করেন। হঠাৎ সাধুজী একদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলেন, "আমার গুরুদেব এই ঔষধ তোমার জন্য দিয়া গিয়াছেন, তিন দিন প্রাতে সেবন করিতে হইবে।" তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অবিকল রূপ বর্ণনা করিলে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ভক্তিভরে তিন দিন ঔষধ সেবন করিলেন, সকল রোগ সারিয়া গেল, তাঁহার যে কোন দিন হাঁপানী ছিল সে বোধ তিরোহিত হইল।

কোন এক মুসলমান অংশীদারকে লইয়া প্রকাশ দাদা কাজে নামিলেন। প্রথম টেণ্ডারেই এক লক্ষ টাকার কাজ পাইলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাহার সহিত বিবাদ বাধিল এবং সেই মুসলমান বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করাইল। পাঁচ ঘণ্টা হাজতে বসিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক তাঁহাকে জামিনে খালাশ করিল। শিয়ালদহ কোর্টে এক বৎসর কাল মামলা চলিল। মুসলমান ভদ্রলোক জেদের বশে ভাল উকীল ব্যারিষ্টার নিয়োগ করিয়া প্রকাশ দাদাকে জেলে পুরিবার সঙ্কল্পে দৃঢ় হইলেন। তিনি গরীব, একমাত্র শ্রীগুরুর নাম সম্বল করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন। সাধ্বী স্ত্রী কমলা রাঁচিতে বিপদের আশঙ্কায় ত্রস্ত। রায় বাহির হইবার পূর্ব্ব রাত্রে শ্রীগুরু স্বপ্নে দেখা দিয়া অভয় বাণী শুনাইলেন। সেই রাত্রে প্রকাশ দাদাও কলিকাতায় শ্রীগুরুর হাস্যবদন দর্শন করিয়া কতকটা ভরসা পাইলেন। পরদিন আদালতে প্রকাশ দাদা আত্মীয়স্বজনসহ উপস্থিত। সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত। নাম

ডাকা হইলে তিনি কাঠগড়ায় গেলেন। জজসাহেব প্রসন্ন-বদনে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রায় দিলেন—প্রকাশ ঘোষ নির্দ্দোষী, আপনি খালাশ।

১৯৫০ সাল। অফিসের সাহেব ঘুষখোর। প্রকাশ দাদা তাঁহাকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করিলেন। সাহেব প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে নানা অজুহাতে সাসপেণ্ড করিলেন। 'যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়' এই ভরসাতেই তিনি শ্রীগুরুতেই আত্মসমর্পণ করিলেন। তিন মাস ধরিয়া তদন্তাদি চলিল, তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন, কার্য্যে পুনর্নিয়োগ হইল।

মাস কয়েক পূর্ব্বে তিনি অফিসে বসিয়া যেন চারি দিকে পরলোকগত গুরুভ্রাতাদের ও শ্রীগুরুকে দর্শন করিলেন। নামানন্দে যেন শরীর অবশ বোধ হইল, চক্ষু চাহিবার শক্তি রইল না, ঐ অবস্থায় বাড়ী ফিরিলেন। কয়েক দিন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় নামানন্দে কাটাইয়া প্রত্যক্ষভাবে শ্রীগুরু দর্শন করিতে করিতে সজ্ঞানে চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। গুরু কৃপাহি কেবলম্। জয় গুরু!

——:o:——

ক্ষমা হি যতিনাম্ ভূষণম্

ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দজীকে উপযুক্ত আধার বুঝিয়া ভগবান্ গোসাঁইজী শাস্ত্রানুসারে নীলকণ্ঠবেশে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে তিনি কি অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণের হলাহল পান করিয়া বিনিময়ে অমৃত পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন, নীলকণ্ঠনামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এত ক্ষমা, এত অনুকম্পা, এত প্রাণঢালা ভালবাসা, এত প্রেম এক তাঁহাতেই সম্ভব ছিল।

একবার ঠাকুরকে তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতা পত্রযোগে জানান যে 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের অমুক ঘটনা লিখিয়া তিনি গোসাঁইজীকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাহা পুস্তকের অন্য সংস্করণে উঠাইয়া না দিলে তিনি তাঁহাকে (ব্রহ্মচারিকে) হত্যা করিবেন। এই ভদ্রলোক শ্রীগুরুর নিকট বহুভাবে উপকৃত। পত্রাদি লেখার ভার তখন এ অধমের উপর ছিল, কাজেই উত্তরে কি লিখিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—'এর আর কি উত্তর দেবে? গোসাঁইজীর জীবনের এত বড় ঘটনা, যা তিনি শ্রীমুখে

বলিয়াছেন, তা বাদ দেওয়া চলে না। আমি ত বুক পেতেই আছি, যার ইচ্ছা খুন করে যেতে পারে।'

পূজনীয় সারদাকান্তজীকে গোসাঁইজীর সমাধি-সেবা হইতে অপসারিত করিরার জন্য তাঁহার গুরুভ্রাতারা ছলে-বলে-কৌশলে নানা প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সকল প্রকারে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহার প্রতিও সকলের অসূয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিণামে মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হইল। একদিন আশ্রমবাসী জনৈক বৃদ্ধ গোসাঁইর শিষ্য শ্রীগুরুর নামে আদালতে মিথ্যা অপযশ ও কুৎসানিন্দা করিয়া আসিলেন। আমাদের সকলের মন এই কারণে বিরূপ ও বিদ্রোহী হইয়া আছে বুঝিয়া ঠাকুর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। রাত্রে শ্রীগুরু আমাদের এক জনকে বলিলেন—"বৃদ্ধ মানুষ, বড় পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন, আফিং ও দুধের যোগাড় হয়েছে কি না সন্ধান নিয়ে ব্যবস্থা করে এসো।" অনুসন্ধানে জানা গেল সত্যই তিনি চিরাভ্যস্ত আফিং ও দুগ্ধ অভাবে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল, তিনি কুটিল হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ঠাকুর পরম ক্ষমাশীল, তাঁহার দ্বন্দ্বাতীত অন্তঃকরণ সর্ব্বপ্রকার স্পন্দন ও অনুভূতিহীন, যেন পাষাণ দেবতা! আমাদের মন কিন্তু তাঁহার প্রতি অনুকূল হইল না। আবার চিত্তশুদ্ধির বিধান দেওয়া হইল। শ্রীগুরু বলিলেন—'বুড়ো মানুষ, বড় ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, একটু পদসেবা করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এসো।' আদেশ পালিত হইল। চোখের

জলে কাকাবাবু বলিলেন—'দেখ বাবা, আমরা ভাই ভাই যত ঝগড়াঝাঁটি করি না কেন তোমরা সেদিকে কান দেবে না। ব্রহ্মচারী চিরকাল আমাদের মায়ের মতন সকল অভাব অভিযোগের খোঁজ রেখে ব্যবস্থা করে, নইলে আমরা কি এখানে আত্মীয়স্বজনহীন হয়ে এভাবে থাকতে পারি। তোমাদের ঠাকুরের কাছে মান অপমান সব সমান, সে যে গোসাঁইজীর হাতে গড়া ব্রহ্মচারী, আমাদের সকলের গৌরব। তাঁর আশ্রয়ে এসে তোমরা গোসাঁইজীরই কৃপা পেয়েছো।'

গোসাঁইজীর প্রত্যক্ষ কৃপাশ্রিত এই সকল মহাত্মাদের অন্তরের এই মহান ভাবটুকু উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইলাম, অন্তরের সকল তিক্ততা ঘুচিয়া গেল।

——:o:——

শ্রীগুরুর মঙ্গল হস্ত সদা ক্রিয়াশীল

সতীর্থ শ্রীকৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আমাদের অবলা দিদি কতিপয় প্রতিবেশিনীসহ এবং পাটনার জমিদার ৺বেহারীলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মচারী মহারাজের আশ্রিতা মাতা নিভাননী দেবী তাঁহার কন্যাগণ ও জন কয়েক বৃদ্ধবৃদ্ধা আত্মীয়গণসহ সেবার প্রয়াগ কুম্ভমেলায় যোগদান করেন। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনার ত্রুটিতে স্নানার্থী বহু যাত্রী ভিড়ের চাপে পদদলিত হইয়া প্রাণ হারায়। এই জনস্রোতের চাপে ইহারাও বহু দূর তাড়িত হইয়া আসেন, হাত পা অবশ হইয়া ভূমিসাৎ হইবার আশঙ্কা, তাঁহাদের পায়ের তলাতেই কত মৃতদেহ, চারি দিকে কান্নার রোল। মৃত্যু অবধারিত বুঝিয়া অসহায়ভাবে সকলে গুরু-গোসাঁইকে কাতর প্রাণে স্মরণ করিতে থাকেন। বিদ্যুৎ ঝলকের মত শ্রীগুরুর দর্শন হয়। হঠাৎ অলৌকিকভাবে জনৈক অশ্বারোহী সিপাহী জনতার স্রোতকে রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং অন্য এক জন পুলিশ তাহার বিরাট লাঠি দ্বারা স্রোতকে রুখিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে শ্রীগুরু কৃপায় তাঁহারা নিজেদের সামলাইয়া লইবার সুযোগ পান এবং প্রাণের মধ্যে ভরসা ও শরীরে নববলের

সঞ্চার অনুভব করেন, দ্রুতবেগে চলিয়া নিরাপদ স্থানে পহুঁছাইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রীনাম স্মরণ করিতে থাকেন।

অবলা দিদির কনিষ্ঠা ভগ্নী কুমারী গৌরী সেবার বাৎসরিক পরীক্ষা দিতে বসিয়াছে। প্রশ্নপত্র দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে কারণ কোন প্রশ্নের জবাবই তাহার পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া বোধ হইল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে তাহার দিদি গুরুগোসাঁইকে স্মরণ করিয়া কেমন অলৌকিকভাবে অবধারিত মৃত্যু হইতে কুম্ভমেলায় রক্ষা পাইয়াছিল। সরল বিশ্বাসে সে কাতর প্রাণে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিল। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার কুমারী গৌরী যেন কোন আত্মার প্রবেশ তাহার দেহ মধ্যে অনুভব করিল এবং অতি সহজভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর অতি অল্প সময়ে লিখিয়া দিতে সমর্থা হইল।

গুরুভ্রাতা কৃষ্ণদাস পাল সম্প্রতি কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। রক্তের চাপ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অবিশ্রান্ত বমনের ফলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হইয়া মৃত্যুর আশঙ্কায় সকলে সন্ত্রস্ত—অতিমাত্র ভীত। সারাক্ষণ অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগ করা হইতেছে, মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িতেছেন। গুরুগত প্রাণ, যখনই জ্ঞান হইতেছে তখনই লক্ষ্য করিতেছেন গুরু-গোসাঁই সস্মিতবদনে পার্শ্বে দণ্ডায়মান। স্বপ্ন নয়, জল্পনা নয়, কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ দর্শন। তাঁহার মত নগণ্যজনের জন্য গুরু-গোসাঁইকে এইভাবে কষ্ট করিতে হইতেছে ভাবিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে বালিশ বিছানা সিক্ত করেন। এইভাবে জীবন-মরণ সংগ্রামে কয়দিন কাটাইয়া তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কৃপার কথা বলিতে গেলে ভাবাবেগে তাঁহার বাক রুদ্ধ হইয়া যায়।

কুম্ভমেলায় ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীকুলদানন্দ

১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাস, চন্দননগর—ঠাকুরবাড়ী। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পূর্ব্ব তপস্যাক্ষেত্র গয়াধামে যাওয়াই স্থির করিলেন। আমি ও যোগেশ ব্রহ্মচারিজী পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিকট একটি সুন্দর বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক রাখিলাম। মহাহোম উৎসবের পর ঠাকুর ৩০।৩৫ জন শিষ্যশিষ্যা সমভিব্যাহারে গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং প্রায় দেড় মাস সেখানে থাকিয়া সকলের তীর্থকৃত্যাদি সমাধান করাইলেন। বিষ্ণুপাদপদ্ম, বৌদ্ধগয়া, গোসাঁইজীর দীক্ষাস্থান ও নিজ সিদ্ধপীঠ আকাশগঙ্গা পাহাড় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে সকলকে লইয়া গিয়া তিনি স্থানমাহাত্ম্য ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের বর্ণনা করিলেন। এখানে তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে বহু শিষ্যশিষ্যা উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ণকুম্ভ মেলায় যাওয়া বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন—'আমি অসুস্থ, মেলায় গোলমালের মধ্যে থাকা সম্ভবপর নয়, তা' ছাড়া এ সব বহু ব্যয়-সাপেক্ষ।' এলাহাবাদের সতীর্থ নলিনী ঘোষ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে

প্রয়াগের মেলার বাহিরে একটি উপযুক্ত বাড়ী দেখিবার কথা বলা হইল। কলিকাতায় সতীর্থ মহানন্দ নন্দীকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া লিখিলাম যে গুরুভ্রাতারা ভরসা দিলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কুম্ভে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা যায়। মহানন্দ দাদা এক শত কার্ড এই মর্ম্মে ছাপাইয়া উপযুক্ত পরামর্শ ও সক্রিয় সাহায্যের আবেদন করিয়া বিশেষ বিশেষ গুরুভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাজগীর যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু অসুস্থতার কারণ রেলগাড়ীতে যাইতে নারাজ। হাজারিবাগের কালেক্টার বিজয় সেন কোন প্রেরণা পাইয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মোটরযোগে সশিষ্য ঠাকুরকে রাজগীর শ্বেতাম্বর জৈন ধর্ম্মশালায় পঁহুছাইয়া দিলেন। সমস্ত দ্বিতল আমাদের বাসের জন্য ব্যবস্থা হইল। ঠাকুরের ইচ্ছামত রেবতীকাকা, ছোট জ্যেঠামশায় ও কিরণকাকাকে আসিতে লেখা হইল এবং তাঁহারা অচিরে উপস্থিত হইলেন। কুণ্ডের উষ্ণজলে স্নান, ঝরণার জল পান, মুক্তবায়ু ও প্রচুর ছাগদুগ্ধ সেবন, রেবতীকাকার সুমধুর কীর্ত্তন, নালন্দা প্রভৃতি তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শন, দরিদ্রনারায়ণসেবা ইত্যাদি নানাপ্রকারে ঠাকুরকে আনন্দে রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। ছোট জ্যেঠামশায় একদিন কথা প্রসঙ্গে মহানন্দ দাদার চিঠির কথা ঠাকুরকে বলিলে তিনি আমাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—'তোমার কথামতই মহানন্দ এমন কাজ করেছে। আমার আকাশবৃত্তি। আমার সারা

জীবনের ব্রত তুমি নষ্ট করলে। আমি কখনও কারও কাছে অর্থ প্রত্যাশা করেছি কি? আমার কোন আচরণে তা যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে আমি অপরাধী। ইচ্ছা হলে লক্ষ লক্ষ টাকা ভুতে দিয়ে যাবে। এখনি জিতুকে টেলিগ্রাম করে দাও যেন সকলকে জানিয়ে দেয়, এই প্রয়োজনে কেউ কোন অর্থ পাঠালে তাহা ফেরৎ যাবে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রয়াগে গেলেও আমি মেলার বহু দূরে থাকব এবং আমার ওখানে কেউ এসে যেন বিরক্ত না করে।' শ্রীগুরুর নির্দ্দেশমত জিতেন্দ্র মোদককে তার করা হইল এবং পত্রযোগে বিস্তারিত লিখিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মেলাস্থান হইতে ছয় মাইল দূরে এলাহাবাদের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে আতরসুইয়া অঞ্চলে কাঁকরাহাঘাটের সন্নিকটে যমুনাতীরে একটি সুন্দর বাংলো তুই মাসের জন্য ভাড়া করা হইয়াছে এবং ইন্‌জিনিয়ার অচ্যুত দাদা পাশে খড়ের ছাউনি নির্ম্মাণ করিতেছেন। প্রয়াগ যাত্রার দিন স্থির হইল। আমি পূর্ব্বে মোকাম ঘাট যাইয়া ষ্টেশনমাষ্টারের সাহায্যে দিল্লী এক্সপ্রেসের একটি বড় তৃতীয় শ্রেণীর বগী গাড়ী সম্পূর্ণ খালি করাইয়া বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে আসিলাম। ঠাকুর গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণসহ প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত ছিলেন এবং আমি টর্চ্চ দেখাইয়া সঙ্কেত করিলে সকলে নির্দ্দিষ্ট কামড়ায় আসিয়া উঠিলেন। সারা রাত্রি আরামে ঘুমাইয়া মকরস্নানের ছয় দিন পূর্ব্বে আমরা প্রয়াগে সকাল বেলা পহুঁছিলাম। ঠাকুর ও জ্যেঠামহাশয় সেবিকা-গণসহ বাংলোতে এবং রেবতী কাকা, কিরণ কাকাসহ আমরা

নিকটস্থ ছাউনিতে পৃথক পৃথক কক্ষে স্থান লইলাম। তিন খানি নৌকা এক মাসের জন্য ভাড়া করা হইল। নিত্য নৌকাযোগে যমুনার মধ্য দিয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে যাইয়া স্নানাদি করিবার ব্যবস্থা করা হইল। সকলেই শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে যাইতে আগ্রহশীল অথচ বাংলো ও ছাউনিতে এত মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকাকড়ির তত্ত্বাবধান কে করিবে ভাবিয়া ঠাকুর চিন্তিত হইলেন। আমি দায়িত্ব লইতে সম্মত হইলে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন এবং আমার মাথায় শ্রীহস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্রমে ক্রমে আশ্রমে ১১৫ জন গুরুভ্রাতাভগ্নী সমবেত হইলেন। দান, ধ্যান, সাধুদর্শন, ভজনকীর্ত্তনে নিত্য উৎসব চলিতে লাগিল। কৃষ্ণনগরের গুরুভ্রাতা বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়ার ও সিভিল সার্জ্জেন হরিশ্চন্দ্র সেনের পিস্তল দুইটি আমার নিকটই থাকিত এবং আমি নির্ভয়ে আশ্রম পাহারা দিতাম।

যোগেশ ব্রহ্মচারিজী মেলাস্থলে চড়ায় গীতা-জ্ঞান-যজ্ঞশালায় আসন লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখে শ্রীশ্রীভোলানন্দগিরি মহারাজের প্রিয় জটাশঙ্করজীর এই নির্জ্জন বাসের সংবাদ জানিয়া প্রায় সকল মণ্ডলেশ্বরেরা কেহ কেহ স্বয়ং, কেহ কেহ প্রতিনিধি পাঠাইয়া ঠাকুরকে বিশেষ বিশেষ দিনে হাতী বা পাল্কিযোগে তাঁহাদের স্নান শোভাযাত্রায় অগ্রণী হইয়া চলিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিয়া নিজের স্বভাবসুলভ বিনয়নম্র বচনে নিজের অক্ষমতা জানাইলেন। উদাসী মহন্তরাও মিছিলে অগ্রণী

হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন এবং ঠাকুর ঐভাবে তাঁহাদিগকেও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আত্মগোপন করাই যাঁহার জীবনের বিশেষত্ব তিনি সাধুদের সঙ্গে চড়ায় বাস বা মিছিলে যোগ দিয়া নিজেকে লোকচক্ষে প্রকাশিত হইবার সুযোগ না দিলেও, দূরে দাঁড়াইয়া গোপনে সাধুদের মিছিল দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যজ্ঞশালার সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী যজ্ঞমণ্ডপের অগ্রভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের সশিষ্যে আসন করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কুম্ভস্নানের দিন প্রত্যুষে মেলাস্থানে উপস্থিত হইয়া মিছিলের রাস্তার পার্শ্বেই ঠাকুর সশিষ্যে আসন পরিগ্রহ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌম্য মূর্ত্তি, অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তি, তুষার শুভ্র তেজঃপুঞ্জ কলেবর, চরণচুম্বিত জটাজাল, সদাশিব নীলকণ্ঠ বেশ, স্নানার্থী সাধুমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং কেহ কেহ তাঁহাকে যোড়হস্তে অভিবাদন করিয়া, কেহ কেহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া মিছিলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক উলঙ্গ নাগা সাধু অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান অবস্থায় সবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার ঘোড়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং তিনি 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলিয়া ঠাকুরের চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তে লাফাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া অগ্রসর হইলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা দর্শনে আমরা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঘী সপ্তমীর দিন (২২।১০।৩৬, বুধবার)

সকালে আমাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং আমাকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া, নানা উপদেশ দান করিয়া কিছুক্ষণ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন; পরে আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত বহু প্রার্থিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন এবং ইহা গোপন রাখিতে আদেশ করিলেন।

চড়ায় সাধুদর্শনে যাওয়ার জন্য ঠাকুরের বালকসুলভ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিতাম কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তিনি চার দিনের বেশী নৌকা হইতে চড়ায় অবতরণ করেন নাই এবং এই চার দিনই আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। নৌকা হইতে নামিয়া তাঁহাকে পাল্কীতে তুলিবামাত্র সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া আমাদিগকে জোর করিয়া সরাইয়া নিজেরা পাল্কী বহন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন এবং নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এক দিন এক ধুরন্ধর পণ্ডিত দণ্ডীস্বামী আসিয়া "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" বলিয়া যুক্তকরে অভিবাদন জানাইলেন এবং সাশ্রু নয়নে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'ইহার ভিতর বাহিরে সন্ন্যাসের সমস্ত লক্ষণ সুপরিস্ফুট। এমন মহাপুরুষ আমার চক্ষে আর পড়ে নাই। আপনারা খুব ভাগ্যবান।' এইভাবে মেলার মধ্যে (কখনও কখনও আমাদের ছাউনিতেও) অদ্ভুত বেশভূষাধারী নানা আকৃতির প্রাচীন ও নবীন সাধু আসিয়া 'মেরা বিজলীকা লাল', 'মেরা রাম', 'মেরা শ্যাম', 'শিব শম্ভো', 'বম্ ভোলা', 'হর হর মহাদেও' প্রভৃতি সম্বোধনে অভিবাদন জানাইতেন এবং অদ্ভুত

ভাষায় বিচিত্র আলাপ আলোচনা করিতেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে পরে কাহারও কাহারও প্রকৃত পরিচয় জানিয়া আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতাম।

একদিন পাল্কীতে করিয়া সমস্ত প্রধান প্রধান মঠে যাওয়া হইল এবং ঠাকুর প্রত্যেক স্থানে উপযুক্ত মর্য্যাদা জ্ঞাপন করার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও ২০০৲, ৪০০৲ ৫০০৲ ১০০০৲ টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন। বৈষ্ণব চার সম্প্রদায়ের সাধুমহন্তগণের দর্শনে ব্রজবিদেহী সন্তদাসবাবাজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন— 'মাত্র দুটি কথা বলবার জন্য এখানে এসেছি। আপনার গুরুদেব কাঠিয়াবাবাজীর বাংলাদেশের উপর যথেষ্ট কৃপা ছিল, তিনি বাংলার বহু নরনারীকে কৃপা করেছেন। আপনিও বাংলার ঘরে ঘরে সাধন প্রচার করুন। আর একটি কথা, আপনার গুরুদেবের নানা প্রদেশে বহু কৃতি সন্তান থাকা সত্ত্বেও বাংলার প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপার নিদর্শনস্বরূপ আপনাকেই গদি দিয়েছেন। আপনিও কোন বাঙ্গালী ছেলেকে আপনার গদির উপযুক্ত করে যাবেন। আরও দেখুন দাদা কুম্ভে যাতে বাঙ্গালী সাধুর আসন পরম্পরাভাবে বজায় থাকে আপনাকে তার ব্যবস্থা করে যেতে হবে।' বাবাজী মহারাজ বলিলেন— আমার বাবাকে একবার বলিয়াছিলাম যে তাঁহার দেহ বৃদ্ধ হইয়াছে' তাঁহার দেহ ত্যাগান্তে এই সম্প্রদায়ে ব্রহ্মজ্ঞ কেউ থাকিবে না কি? তাতে তিনি 'কিসিকো কর লেঙ্গে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন।' শ্রীশ্রীভোলানন্দগিরি মহারাজের গদিতে অধিষ্ঠিত মহাদেবানন্দজীর সঙ্গে মর্য্যাদার আদান প্রদান

কালে ঠাকুর সন্তদাসবাবাজীকে যে দুটি প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন তাহারই পুনরুক্তি করেন। বাংলার অভ্যুত্থানের জন্যই তাঁহার জীবন ধারণ। বাংলাদেশের উপর মহাপুরুষগণের কৃপা বর্দ্ধিত হউক, বাংলার সন্তানেরা ধর্ম্মজগতে অগ্রণী হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করুক্, ইহাই ছিল তাঁহার প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। মহাদেবানন্দ স্বামিজী তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—'শঙ্করাচার্য্য সাধু সংগঠনের উদ্দেশ্যে দশনামী সন্ন্যাসীর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং আপনারা সেই সাম্প্রদায়িক সংস্কারে চালিত হন। ঋষিরাই ধর্ম্মের চরম সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়াছিলেন এবং গোসাইজী সন্ন্যাস-সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকিলেও সেই ঋষিদিগেরই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। চতুঃসনই সনাতন ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক এবং এই সনক সনাতনাদি ঋষিরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। সন্ন্যাস, পারমহংস প্রভৃতি অবস্থা ইহারই অধীন। আমাকেও গোসাঁই কৃপা করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী করিয়া গিয়াছেন।'

ভক্তগণের উৎসাহজনক প্রস্তাবে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন সাধুসন্ন্যাসীগণকে সমষ্টিভাণ্ডারা দিতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। কৈলাশ মঠের শ্রীমৎ কুমারানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় পঞ্চমী স্নানের পরদিন সহস্র সহস্র সাধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়। পংক্তিতে উপবিষ্ট মণ্ডলেশ্বর ও মহন্তগণকে উপযুক্ত অর্চ্চনা ও মর্য্যাদা দানের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা সসঙ্কোচে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—'আপ্ তো

মহাপুরুষ হঁয়, আপ্‌সে হম্‌লোগ ক্যায়সে পূজা লেঁ, হম্‌-লোগোঁকো অপরাধী ন করেঁ।' শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"ইয়ে শরীর কাহিল হো গয়া, আব্‌ তো যানা হ্যায়, আপ্‌ সবকো পূজা করনেসে দুনিয়ামে আর্য্য ঋষিওঁকা কায়দা বহাল রহেগা।"

সাধুদর্শন, সেবা, দান ভাণ্ডারা প্রভৃতি কার্য্যে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইল, কোথা হইতে কিভাবে এত অর্থ আসিল (বুঝি বা ভূতেই জোগাইল) তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। আসিবার সময় অত্যন্ত ভিড়ের মধ্যেও এক রেলওয়ে ম্যাজি-ষ্ট্রেটের সাহায্যে একটি খালি কামরার সুব্যবস্থা করা হইল এবং আমরা মহানন্দে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জয় গুরু!

——:০:——

মহাপ্রয়াণে শ্রীশ্রীজটাশঙ্কর বাবা

স্মচনা ও ইঙ্গিত—১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে প্রসিদ্ধা শ্রীনামসাধিকা মাতা লেডি গৌরাঙ্গ (Lady Gauranga) শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে উপস্থিত হন। উভয়ে নির্জ্জনে অনেক ক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন। বিদায়-ক্ষণে মা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"মহাপ্রস্থান সমূহ নিকট, দেখা অন্তকালে!" ঠাকুর বলিলেন—"মাঝে একটা পর্দ্দা বই ত নয়—! এ-পার আর ওপার, সবই সমান, আনন্দধাম।"

একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—"কেষ্টদাসের পালে বাঘ পড়ার মত হ'বে। বার বার অসুখ হচ্ছে, টেলিগ্রাম যাচ্ছে, ভাল হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যখন সময় হবে তখন কেউ টেরও পাবে না।"

অন্য একদিন বলিলেন—"তোদের মত সুখী ত্রিভুবনে কেউ নাই রে, যে কয় দিন পারিস্ ভোগ করে নে, আর কয় দিন ?"

সেবার ত্রুটি দেখিয়া একদিন বলিলেন—"অনেক দিন ভুগছি, সেবা করতে করতে বিরক্তি ত আসবেই। ছেলেও বেশী দিন

অসুখে ভুগলে মা তার মৃত্যু কামনা করেন। মহাপ্রভু সেবার অবহেলা দেখেই চলে গিয়েছিলেন।”

পুলিনপুরী ভবনে একদিন তাঁহার ফিডিং কাপ আনিতে ভুল হইয়াছিল এবং অন্য পাত্রে কমলালেবুর রস দেওয়া হইলে বলিলেন,—“সমাধি মন্দিরে আলমারী হবে, তাতে এরপর এসব জিনিস সাজিয়ে রেখে দেখ্‌বি, আর বেশী দিন দেরী নাই।”

বিছানার চাদর অপরিষ্কার দেখিয়া একদিন বলিলেন,—“এখন ত লক্ষ্য করছিস না, এরপর এগুলি বুকে নিয়ে কাঁদবি।”

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের বিশেষ ধারণা যে তাঁহার কার্য্য শেষ হইলেই তিনি লীলা সংবরণ করিবেন। তাই তিনি সম্প্রতি তাঁহার ভবিষ্যৎ সমাধি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকিলেও তাঁহারা তেমন আমল দিতেন না। বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া একদিন ইন্‌জিনিয়ার অচ্যুত নন্দীকে বলিলেন—“কিছু ত করলে না, এর পর ঠক্‌তে হবে।” পরে অবশ্য তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী শ্রীমন্দিরের ভিত্তি তৈয়ারী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

চন্দননগর ঠাকুরবাড়ীতে মহাষ্টমী তিথিতে মহাহোম তিন চার ঘণ্টা প্রজ্জ্বলিত বিরাট অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া অলৌকিক লীলা দেখাইলেন। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের দারুণ দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া ডাক্তারেরা সকলে এক বাক্যে হোমে বসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু আসন্ন মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া তিনি

বলিলেন—"বাধা দিও না, এই আমার শেষ হোম, যা পার করে নাও।"

গয়াতীর্থে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন এবং তাঁহার গুরুদেবের দীক্ষাক্ষেত্র এবং তাঁহার তপোভূমি আকাশগঙ্গার অশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। গয়া যাত্রার প্রাক্‌কালে কলিকাতা আশুপাল ভবনে একদিন সমবেত শিষ্য-গণের সমক্ষে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার বিদায়বাণী ঘোষণা করেন। রুদ্ধকণ্ঠে করযোড়ে তিনি বলিলেন—"আমি ত বৃদ্ধ হয়েছি, বয়স ৬৩ বৎসর, তোমরা আমার বুকের ধন, ভবিষ্যতের আশা, তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে আমার স্থানে চলে যেতে দাও।" অন্য দিন সমবেত শিষ্যাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাবুদের কাছ থেকে ত আমি বিদায় নিয়েছি, তোরাও আমায় বিদায় দে।"

গয়ায় কার্ত্তিক মাসে তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে বহু শিষ্যশিষ্যা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে সমারোহে পূজা করিয়া ধন্য হইল। তিনি বলেন—"এই বোধ হয় শেষ জন্ম-উৎসব, প্রাণ খুলে আনন্দ করে নে।"

রাজগীর শ্বেতাম্বর ধর্ম্মশালায় মাসখানেক থাকা হয়। আমি দ্বিতীয়বার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রার্থনা করিলে বলিলেন—"ব্রহ্মচারীই ত আছ। ব্রহ্মচর্য্য কতকগুলি ব্রতের অধীন থাকা বই ত নয়? চাকুরীর সঙ্গে যোগ থাক্‌লে ঠিক আনুষ্ঠানিকভাবে চলা যায় না। সময়ে হবে।"

রাজগীর হইতে সদলবলে শ্রীশ্রীঠাকুর কুম্ভমেলা উপলক্ষে

প্রয়াগধামে আসেন এবং মেলাস্থান হইতে ছয় মাইল দূরে যমুনাতীরে অবস্থান করেন। যমুনার কাল জল, বিশুদ্ধ বায়ু, ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান, বহু সাধু দর্শন, মেলার রমণীয় দৃশ্য, শিষ্য-শিষ্যাগণের প্রাণঢালা সেবা, তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা ও মানসিক অবসাদ দূর করিত। কিন্তু তিনি নিজে তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি বোধ করিতেন না। লীলাসংবরণের দিন সন্নিকট বুঝিয়াই তিনি যেন চড়ায় বাস বা সাধুদের শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেন না। তাঁহার যেন সকল কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, আনন্দ উৎসবের সকল প্রলোভনের অনেক দূরে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। সমষ্টিভাণ্ডারার দিন পংক্তিতে উপবিষ্ট মণ্ডলেশ্বরদিগের অর্চ্চনা ও মর্য্যাদা দান কালে তাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করিলে, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—"ইয়ে শরীর তো কাহিল হো গয়া, ইয়ে তো অব চল্ রহা, আপ সব্‌কো পূজা করনেসে আর্য্য ঋষিওঁকা কায়দা বহাল রহেগা।"

আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা কোনও অপরাধের জন্য পুরী আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং বহুদিন নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এই সময় আমাদের কুম্ভের ছাউনিতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া একদিন সমবেত সকলকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের এই স্বেচ্ছাচারী মনোমুখী ভাব দেখে আমার আর দেহে থাক্‌বার ইচ্ছা নাই। কেউ কাছা খুললে, কেউ বিচিত্র তিলক চর্চ্চা করলে, কেউ জটা রাখলে, নানা প্রকার মালা ধারণ করলে, কেউ সাধু ব্রহ্মচারী বলে নিজেকে প্রচার করে বেড়াচ্ছ, কোন

আদেশ বা উপদেশ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না। প্রতিষ্ঠা যে শূকরী বিষ্ঠা, দারুণ অধঃপতনের কারণ, এ বোধ নাই। কতই ত শেখাবার ছিল কিন্তু তোমরা একটা কেউ অনুগত হলে না, একটিও মানুষ পেলাম না, এ আপশোষ আমার মলেও যাবে না। দেবতার প্রিয় চিহ্নই সম্প্রদায়ের চিহ্ন। কোন দেবতা তোমাদের উপাস্য নন। সকল দেবতা যাঁকে উপাসনা করেন তিনিই তোমাদের উপাস্য। তাঁর কোন নির্দ্দিষ্ট প্রিয় চিহ্ন নাই কাজেই তোমাদের কোন সাম্প্রদায়িক বেশভূষা নাই। অথচ যে কোনও সম্প্রদায়ের চিহ্ন তোমরা ধারণ করতে পার। ঠাকুর আমাকে মাত্র নীলকণ্ঠ বেশ দিয়েছিলেন, কোনরূপ তিলক ধারণ করতে বলেন নাই। আমার ভেতরে যখন তিলক-চর্চ্চা করবার আকাঙ্ক্ষা জাগলো তখন আমি ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র একত্রে ধারণ করলাম এবং প্রবালাদি মালা দ্রব্যগুণ হিসাবে গ্রহণ করেছি। তোমরা যতই বেচাল চল না কেন, যত দূরেই থাক না কেন, আমার দৃষ্টির বাহিরে নাই।"

মাঘী সপ্তমী তিথিতে (২২শে মাঘ, বুধবার) আমাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"আর সুযোগ পাই কিনা বলিতে পারি না তাই সব নিয়ম বলে গেলাম। এই নিয়মে সাধারণতঃ বার বৎসর চলতে হয়, তোমার নয় বৎসর চললেই হবে। সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ব্যস্ত হবে না, চাকুরীর বন্ধন শীঘ্র আপনি খসে যাবে, তখন নিজ নামে আনন্দ

যোগ করে নেবে। এসব সম্পূর্ণ গোপন রাখবে।" ঠাকুর-ঘরের বাহিরে আসিলে দরবেশ কাকা, রেবতী কাকা ও ছোট জ্যেঠামশায় আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কুম্ভমেলা হইতে ফিরিয়া তিনি চন্দননগর আশ্রমে শেষ শিবরাত্রি উৎসব করেন। এই সময় একদিন বেলতলায় আমাদের গুরুভ্রাতা বগলা দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"চাকুরী ছাড়ার পর তুমি এই মন্ত্র জপ করবে এবং এইভাবে চলবে। আর কিছু বলবার সুযোগ পাই কিনা বলা যায় না।"

শ্যামপুর (হাওড়া) শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম লীলাক্ষেত্র। বহু বৎসর যাবৎ তাঁহার সঙ্গলাভে পরিতৃপ্ত নরনারী এখানে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গোসাঁইজীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছেন। আশ্রমের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীবিষ্ণুপদ বেরা এতদিন প্রার্থনা করিয়াও আর ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইতে পারেন নাই। এইবার শ্রীগুরুদেব সম্মতি দান করিলে আমি ষ্টীমারের ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন সেখানে তাঁহার দেবোত্তর পত্রে উল্লিখিত আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সেবাপূজার সুব্যবস্থা করিয়া নিজ বিশেষ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। এতদিনের সঙ্কল্পিত এই অর্দ্ধ সমাপ্ত কার্য্য শেষ করাও লীলাসম্বরণের পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে হইল। উপস্থিত বহু দীক্ষা-প্রার্থীকে তিনি নির্ম্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া একদিন একখানি বন্ধ খাম তাঁহার

বিশ্বস্ত অনুচর মহানন্দ দাদার হাতে দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"মানুষের শরীর কিছুই বলা যায় না, হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়ে পড়ে তখন এর ভেতরে যেমন যেমন লেখা আছে সেই মত কাজ করবে। তার পূর্ব্বে এখানা খুলবে না।" দেহত্যাগের পর দেখা গেল সর্ব্বান্তর্যামীর হস্তাক্ষরে সুস্পষ্ট লিখিত আছে কোন দিন, কোন সময় কিভাবে দেহত্যাগ হইবে, কিভাবে পুরীতে লইয়া গিয়া, কিভাবে নির্দ্দিষ্ট সমাধিকুণ্ডে সমাহিত করা হইবে, সমাধির উপর কিভাবে শ্রীমন্দির উঠিবে, সেবাপূজা ভোগরাগ কিভাবে চলিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে পুরী আশ্রমে আসিলেন। ছোট জ্যেঠামশায় ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এইবার গোসাঁইজীর তিরোভাব মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয় যেন ঠাকুরই বহন করেন। ঠাকুর সম্মত হইলেন এবং শিষ্যগণকে কর্ম্মের ভার দিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যেন তাঁহার গুরুভ্রাতাভগ্নীগণ তাহাদের ব্যবহারে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হন। উৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইল।

একদিন পতাকী পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপাভাজন শ্রীশ্রীআশু হরিদাস শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। শ্রীগুরু নিজে কোন আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি যেন কোন সুদূর রাজ্যে বিচরণ করিতেন, সর্ব্বদা ভাবমগ্ন—অন্তর্মুখী অবস্থা। প্রয়োজন মত কোন শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেন এবং তাহার দ্বারাই আগন্তুকের যাবতীয় প্রশ্নের

সুসমাধান করাইতেন। সেই মত যোগেশ ব্রহ্মচারিজী হঠাৎ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীশ্রীআশু হরিদাস যে ৺জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন না এবং তাহাতে যে গোসাঁইজীর অবমাননা করা হয়, তাহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রমাণিত করেন। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত অপমানিত বোধ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেশদাকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং নিজে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এখন কেবল শান্তির বাণীই শ্রীমুখে, সাম্যভাবই প্রতি কার্য্যে পরিলক্ষিত হইতেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিলেন এবং অনেকক্ষণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিলেন। ঠাকুরের অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা: আমি নিজের মধ্যে যেন একটা শক্তির আলোড়ন লক্ষ্য করিলাম এবং নানা শাস্ত্র হইতে উক্তি উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম যে নিজে ধর্ম্মজীবন লাভ না করিলে, যুক্তযোগী না হইলে, বক্তৃতা দ্বারা জগতের কল্যাণ করা যায় না বরং অনিষ্টই করা হয়। ছোট জ্যেঠামহাশয় 'হরের্নামৈব কেবলম্' বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। শ্রীগুরুদেব মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক আমাকে সমর্থন করিতেছিলেন কিন্তু আমার প্রগলভতা বুঝিয়া আমি নিজে পরে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলাম।

একদিন রামকৃষ্ণ মিশনের দুই জন উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী পুলীনপুরীতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া নানা

কথাপ্রসঙ্গে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে গোসাঁইজী যাহা কিছু লাভ করিয়াছেন তাহা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাতেই। ঠাকুর ধীর স্থির গম্ভীর। জনৈক গুরুভ্রাতা যেন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন 'প্রচার কৌশল দ্বারা কাকেও অবতার দাঁড় করান যায় না, করিলেও তাতে জগতের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। পরমহংসদেব নিজেই বলেছেন "আগে চাপরাস্ পাও পরে প্রচার।" উপযুক্ত ধর্ম্মজীবন লাভ করা চাই। গোসাঁইজী নিজ ধর্ম্মজীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট ও সরল বিবৃতি দিয়ে গেছেন তাতে যাঁদের নিকট তিনি ধর্ম্ম লাভে সাহায্য পেয়েছেন সেই সাত জন মহাপুরুষের নাম আছে কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের নাম তাহাতে পাই না। মানস সরোবরের পরমহংস ব্রহ্মানন্দজীর নিকট হ'তে দীক্ষা গ্রহণের পরই তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব অবস্থা খুলে যায়, সমস্ত অভাব মোচন হয়, তিনি ব্রহ্মানন্দসাগরে সঞ্চরণ করতে থাকেন। তখন "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" অবস্থা। পরমহংসদেব স্বমহিমায় মহিমান্বিত, তাঁহাকে আপনারা 'সদ্গুরু শ্রীজগৎগুরুরূপে' প্রচার করেন কোন আপত্তি নাই কিন্তু অন্যান্য মহাপুরুষকে তাঁহার শিষ্য ভক্ত বলে রটাবার এ অপপ্রয়াস কেন? 'কোথাও দুই আনা, কোথাও চার আনা, এখানেই ষোল আনা' কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গোসাঁইজী নিজ বক্ষে হাত রেখে বলতে চেয়েছিলেন যে বাইরে কোথাও কিছু নাই, নিজের মধ্যেই ভগবান্ আছেন, তাঁকেই উপযুক্ত সাধনভজন দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে হবে। 'কথামৃততে' তার কদর্থ করা হয়েছে। আমরা

দেখতে পাই যে বিপিন পাল, 'ডন' পত্রিকার সতীশ মুখুজ্জে, অশ্বিনী দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি দিক্‌পালগণ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গের প্রভাবে অনুপ্রাণিত না হয়ে গোসাঁইজীরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং কতলোককে সদ্‌গুরু গোস্বামীজীর আশ্রয় নিতে পাঠিয়েছেন।" স্বামীজীরা কতকটা ক্ষুণ্ণ মনে স্থান ত্যাগ করিলেন। গুরুভ্রাতাটি শঙ্কিত ছিলেন বুঝি বা শ্রীগুরু তাঁহার বাচালতার জন্য তিরস্কার করেন কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না।

উৎসবের পর হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য ক্রমাবনতির দিকে চলিতে লাগিল। তিনি কি সাধক, কি সিদ্ধ অবস্থায় যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কর্ম্ম ও চিন্তার ধারায় পরিচালিত তাহাতে সকলের ধারণা ছিল যে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও সুশৃঙ্খলা স্থাপন না করিয়া তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিতে পারেন না। মহানন্দ দাদা দেউলিয়ার দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া শ্রীগুরু বলিলেন—"আজ বড় আনন্দের দিন। মহানন্দকে লিখে দাও, শীঘ্র চলে আসুক, আমাকে নিয়ে আর কয়দিনই বা থাকবে, যে কয়দিন আছি সে কাছে কাছে থাকে, এই ইচ্ছা করি।"

দশহরার পুণ্য তিথিতে সমুদ্রস্নানের আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহাকে চেয়ারে করিয়া তীরে লইয়া যাওয়া হয়। স্নান করিয়া তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেন এবং বলেন—"আঃ, অনন্ত সমুদ্র, এর স্পর্শেও মনকে পবিত্র ও প্রফুল্ল করে, আরও কিছুক্ষণ গলা ডুবিয়ে থাকি, আর ত স্নান করবো না।"

গুরুভ্রাতা ক্ষিতীশ বাবু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ ইউনানের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ঔষধ আনিয়া খাওয়াইলেন। অসুখ বৃদ্ধি পাইল, আহারে অরুচি এবং অবসন্নতা অত্যধিক পরিমাণে দেখা দিল। ঠাকুর বলিলেন—"এই আমার শেষ ঔষধ খাওয়া। হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার।"

জিতু দা তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন কারণ এখানে তেমন ফল পাওয়া যায় না এবং ডাক্তারের মতে ফলের রসই বর্ত্তমানে তাঁহার প্রধান খাদ্য। ঠাকুর বলিলেন—"কেন, কলিকাতা হতে রোজ একটা করে ফলের পার্শ্বেল আনাতে পারিস না? না হয় রোজ ১০৲ টাকা খরচ হবে। ক'টা দিন আর খাওয়াবি, তোরা আমার জন্য কি চেষ্টা করেছিস্?"

গুরুভগ্নীরা তিন চার রংএর কালি ভরিয়া কয়েকটি ঝর্ণা কলম শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিয়াছিলেন। তিনি বালকের মত একটি কাগজে নানা রংএ চিত্র করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি লিখিয়া যেন অতি সুন্দর একটি চিত্রপট আঁকিলেন। আমরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সুকৌশলে মাঝখানে লিখিয়াছেন "আমার এবারকার কাজ শেষ হইল।"

ঐদিন আমাকে বলিলেন—"দেখ, আমি খাতায় ষষ্ঠ খণ্ড ডায়েরীর সূচীপত্র লিখেছি। তুমি ছয় মাস আরও ছুটি নিয়ে আমার কাছে থাক। আমি ত নিজে লিখতে পারবো না,

তোমাকে বলে দিতাম, তুমি লিখে ওখানা শেষ করতে।" গোসাঁইজীর অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তী অদ্ভুত কয়েকটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমাকে লিখাইতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া নিরস্ত হইতে অনুরোধ করায়, তিনি বলিলেন—"মহানন্দ ও তুমি ডায়েরীগুলি পড়ে যেমন ভাল বোঝ করবে। আমি ত ডায়েরীগুলি নষ্টই করে দিয়ে যাব বলেছিলাম। অনেক গুহ্য কথা এতে আছে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরুভ্রাতা ডাক্তার বিপিন বাবু দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন অনেকেই ত সাধন দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে সদ্‌গুরু কে? কি লক্ষণ দ্বারা সদ্‌গুরু চেনা যায়?" শ্রীগুরু উত্তর করিলেন—"মহাপুরুষেরা সকল বিষয়েই লৌকিক ব্যাপারের অনুসরণ করেন, সাধারণ লোকের মতই জীবন কাটান, কাজেই বাইরের লক্ষণ দ্বারা সদ্‌গুরু চেনা কঠিন। পূর্ব্ব জন্মের সাধন ও সুকৃতির ফলে শিষ্য যখন নিজ গুরুতে 'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং' ইত্যাদি লক্ষণ দেখ্‌তে পায় তখনই গুরু তার পক্ষে সদ্‌গুরু। ভগবান্ অনেক, সদ্‌গুরু কিন্তু এক। আধার উপযুক্ত হলে সময়ে সদ্‌গুরু শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হয়ে তাকে কৃপা করেন, স্বয়ং সদাশিবই সদ্‌গুরু। গোসাঁইজীর দেহত্যাগের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করলাম যে এর পর আপনাকে পাব কি? গোসাঁই বললেন—'এরপর ভগবানকে পাবে, তবে আমাকে পাবে কি না বলা যায় না।' এখন ভেবে দেখুন গিয়ে।"

কিরণ কাকাকে পর দিন ঠাকুর বলিলেন—"কিরণ!

ছোড়দাদা কি আমার অসুখের কথা কিছুই জানেন না? মন্দির ত চিরকালই থাকবে, ব্রহ্মচারী যে কোথায় চল্‌লো, একবারও কি তা ভাবেন?"

সেবিকা নূতন দিদি খাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় লইয়া বলিতে গেলে ঠাকুর বলিলেন—"যখন যা' খেতে চাই আর বাধা দিও না। ভাত খেতে পারব না ব'লে অন্য সময় খেতে চাইলে দেবে না, তা আর করো না, এ খাওয়ান আর বেশী দিন ত নয়। যখন যা খেতে চাই, তার প্রতিবাদ করো না।"

কিরণ কাকা বিদায় লইবার কালে ঠাকুরকে বলিলেন—"এদের মুখ দেখে বড় কষ্ট হয়, মুখগুলি যেন কালি হয়ে গেছে। তুমি ইচ্ছা করলেই ত ভাল হয়ে উঠ্‌তে পার।" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করিলেন—"ইচ্ছা করলে ত সবই হয়, তবে ইচ্ছা করবো কেন? রয়েছি এক জনের হাতে।"

বসন্ত দাদাকে ঠাকুর বলিলেন—"তুমি বৌঠানকে ধানবাদে পহুঁছে দিয়েই কলিকাতায় জিতুর বাসায় গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, আমি শীঘ্র সেখানে যাচ্ছি।"

কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্ব দিন শ্রীশ্রীঠাকুর মাণিকের মাকে ও মৃত্যু দিদিকে বলিলেন,—"আমার বড় ক্লেশ হচ্ছে, আমি জটা কাট্‌তে চাই; সকলকে জিজ্ঞেস কর, হেমবাবুকে ও জিতুকে ডেকে দে।" ঠাকুর একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার জটাই তাঁহার শক্তি সুতরাং সকলে শশঙ্কিত হইলেন যে জটা কাটিলেই ঠাকুর শক্তিহীন হইয়া দেহ ধারণে অসমর্থ হইবেন। কিরণ কাকা, রেবতী কাকা, ছোট জ্যেঠামশায়

অনুমতি দিলে, পঞ্জিকা দেখিয়া ১২।১৫ মিনিটে জটা কাটিবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ছোট দা ও যোগেশ দা একটি বড় জটা ও শিখা জটা রাখিয়া অবশিষ্ট চারিটি জটা মূল পর্য্যন্ত কাটিয়া দিলেন।

বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সাধের বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইজিচেয়ারে করিয়া তাঁহাকে ঘোরান হইল। প্রত্যেকটি গাছ ও লতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি এমন ভাব, ইঙ্গিত ও ভাষা প্রয়োগ করিলেন যেন স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি তাহাদের নিকট হইতে চির বিদায় লইতেছেন। শ্যামলী ধবলী গাভী ও লক্ষ্মী ঘোড়ার মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহাদের চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইল। বড় দিদি মনোরমা শ্রীমাণী ও অন্যান্য সকলের ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুর সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিলেন যে তিনি ঠিক সাত দিন পরেই আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিবেন কারণ এটাই তাঁহার পরম শান্তির ধাম। গোসাঁইর সমাধিতে নমস্কার করিতে করিতে এমন সজল সতৃষ্ণ নয়নে অনেকক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত সকলের মনে শেষ বিদায়ের আশঙ্কা সূচনা করিয়াছিল।

অতি কষ্টে একটি সেকেণ্ড ক্লাস কুপে বার্থ যোগাড় করিলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া সকলে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে আমাকে কটক ষ্টেশনে নামিতে হইল এবং সিভিল সার্জ্জেনের সার্টিফিকেট দিয়া অবসর বাড়াইয়া লইতে ২।৩ দিন অপেক্ষা করিতে হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর দলবলসহ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে

বিদ্যুৎ বর্ণে গোসাঁইজীর প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল এবং এই মুহূর্ত্তে শ্রীমুখ হইতে "বাবারে! আর পারি না" ধ্বনি উচ্চারিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার প্রাণসঙ্কট রোগে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াও কষ্টসূচক কোন বাক্য কখনও উচ্চারণ করেন নাই। এখন এই কথা শুনিয়া সকলে বিচলিত হইলেন। বারিদ বাবু ও সত্যরঞ্জন দাদাকে অবিলম্বে ডাকা হইল। বারিদ বাবুর শেষ চেষ্টা, তিন ঘন্টার জন্য একটি ঔষধ দিলেন। কোন উপকার পরিলক্ষিত না হওয়ায় ডাঃ সত্যরঞ্জন ইন্‌জেকশান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীহস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"ভাল হওয়া নিয়ে কথা, ভাল বোঝ দাও।" বৈকাল বেলা ইনজেক্‌শান দেওয়া হইল। বহুমূত্র রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সত্যব্রত বাবু পরীক্ষা করিয়া আরো দুইবার ইনজেক্‌শান দিতে বলিলেন। মাধবতর্কতীর্থ মহাশয় নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—"মহাপুরুষ সমস্ত অবস্থা চেপে রেখেছিলেন, সকাল থেকেই শ্বাস উঠেছে।" রাত্রি দশটায় ডাঃ বিধান রায় পরীক্ষা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে শুধু দুর্ব্বলতার কথাই বলিলেন। বহু গুরুভ্রাতাভগ্নী বিষাদের ঘন অন্ধকারের মধ্যে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অশান্ত মনে, সশঙ্কিত চিত্তে শ্রীগুরুর শয্যাপার্শ্বে সমবেত হইতে লাগিলেন। শ্রীগুরুর অশ্বমেধের ঘোড়া ৺নলিনাক্ষ তা'র একমাত্র কন্যা আশৈশব গুরুর স্নেহে প্রতিপালিতা, অপূর্ব্ব সেবাপরায়ণা মৃদু দিদি শয্যার এক পার্শ্বে এবং যোগেশ দা ও এই অধম অপর পার্শ্বে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভীত চকিত নয়ন শ্রীমুখের উপর নিবদ্ধ

রাখিয়া দোদুল্যমান হৃদয়ে প্রস্তরবৎ উপবিষ্ট। ডাক্তার সত্যরঞ্জন দাদা রাত্রি দুই ঘটিকার সময় নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কান্নার সুরে সকলে নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক "এখনও দেরী আছে" বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন।

কাল রাত্রি বুঝি প্রভাত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিলেন এবং সামান্য চা পান করিলেন। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। বসন্ত দাদা এস্‌রাজ সহযোগে "তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার" গান ধরিলে শ্রীগুরু সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখার মত অবস্থা। অল্পক্ষণ পরেই অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সমাধিমগ্ন নাড়ীশূন্য স্পন্দনহীন অবস্থা, শ্রীমুখমণ্ডল স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, প্রশান্ত দেবদেহে সে কি পবিত্র পুষ্প চন্দনের ও ধূপ ধুনার সুগন্ধ। গুরুভ্রাতা কবিরাজ অন্নদা কিশোর মকরধ্বজ ও মৃগনাভি সেবন করাইলেন, দেবদেহে স্পন্দন লক্ষিত হইল। বরফ খণ্ড মধ্যে মধ্যে শ্রীমুখে দিলে তাহা চর্ব্বণ করিয়া খাইতে লাগিলেন। শ্রীগুরুর মানস কন্যা মৃদু দিদি শ্রীললাটে ও দেবদেহে তিলক-চর্চ্চা করিলেন, মালা-গুলি পার্শ্বে সুসজ্জিত রাখিলেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রোহিণী কাকা ক্রন্দনের সুরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীনাম স্মরণ করিতে বলিলে সস্মিত মুখে প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"তবে সারা জীবন কি করলাম?"

...

পুরীধাম হইতে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া গঙ্গাতীরে স্নান ও

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ছোট জ্যেঠামশায় নয়টার সময় উপস্থিত হইলেন। স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার আসন্ন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রেমবিহ্বলভাবে সারা দেহে হস্তলেপনপূর্ব্বক অশ্রুপাত করিলেন, 'জয় গুরু' 'জয় গুরু' উচ্চারণ করিয়া শ্রীমুখে ৺মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল দিলেন। স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদ্যুৎ আভায় প্রকোষ্ঠটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শ্রীললাট হইতে তীব্র আলোকচ্ছটা প্রকাশ পাইয়া মস্তক শীর্ষে বিকশিত হইয়া উঠিল। শ্রীগুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া, সমবেত সকলের প্রতি সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া, করযোড়ে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া, অকুলের কুলদাতা কুলদানন্দ, সাক্ষাৎ প্রেমাবতার, মূর্ত্তিমান সদাশিব নীলকণ্ঠ মহাদেব, উদাস দৃষ্টি অনন্তের দিকে সুনিবদ্ধ করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণপূর্ব্বক স্বস্থানে মহাপ্রস্থান করিলেন।

সিদ্ধ সাধক সন্তোষনাথজীর মত গুরুনিষ্ঠ ভাগ্যবান কেহ কেহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন,—শ্রীগুরুর তেজোদ্দীপ্ত দেবদেহ অপরূপ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত এবং সুসজ্জিত স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন। মস্তকোপরি মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণছত্র, অপ্সরা কিন্নরীরা চামর ব্যজনে নিরত। অসংখ্য দেবদেবী ঋষিমুণিগণ সিংহাসনটি স্কন্ধে বহন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং একটি বিরাট স্ফটিক নির্ম্মিত তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলেন। জয় গুরু—শ্রীগুরু !!!

——:০:——

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর মধুর ভাব

সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের দিক্‌টা অপ্রকাশ রাখিবার জন্য চেষ্টিত থাকিলেও ইহা তাঁহার ভাববিহ্বল অন্তর্ম্মুখী অবস্থায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। এই প্রকার কতকগুলি ঘটনা 'মন্দির', 'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকা ও 'যোগিরাজ কুলদানন্দ' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের মাধ্যমে আমি জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছি। ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি বিস্তার তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহার সাধক অবস্থায় বা আচার্য্যজীবনের প্রথম দিকে যাহাই হউক, আমরা যখন হইতে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম তখন হইতে তাঁহার অলৌকিকত্বের যে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, সেগুলি অপেক্ষা তাঁহার মধুর ভাবই আমাদিগকে তাঁহার প্রতি বেশী অনুরক্ত করিয়াছিল। এত দরদ, এত সহানুভূতি জীবনে কাহারও কাছে পাই নাই; এত ভালবাসা এতখানি প্রেম-মাধুর্য্য আর কাহারও মধ্যে থাকিতে পারে বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির প্রেম ইহার নিকট ম্লান ও তুচ্ছ হইয়া যায়। এই

প্রেম ছিল একটা জ্বলন্ত বা জীবন্ত বস্তু, যাহা প্রাণের দ্বারা অনুভব করা যায় মাত্র, ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

বার বার শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াও দেখার পিপাসা মিটিত না—চাকুরী করিতে করিতে যখনই সুযোগ পাইতাম তাঁহার শ্রীচরণে উপস্থিত হইতাম, ভাববিহ্বল নেত্রে তাঁহার প্রসন্ন বদন পানে তাকাইয়া থাকিতাম। অন্তরে কত জিজ্ঞাসা লইয়া যাইতাম কিন্তু সে চাঁদমুখ দেখিয়া সব ভুল হইয়া যাইত। যে দু'একটা প্রশ্ন করিতাম তাহার যে সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইতাম তাহাতে শুধু সকল সমস্যার সমাধানই হইত না, তাঁহার কথাগুলি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত। সেগুলি ছিল অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রেমরসাভিষিক্ত। সমস্ত হৃদয় দিয়া সেই মাধুর্য্যরস উপভোগ করিতাম—প্রাণ ভরিয়া সেই প্রেমসুধা পান করিতাম। এই অভিজ্ঞতা শুধু আমার একার নহে, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণের কথা।

বাহির হইতে তাঁহাকে অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হইত কিন্তু একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে তাঁহাকে অনেক সময় ভক্ত সঙ্গে রঙ্গরসে প্রবৃত্ত থাকিতে দেখা যাইত। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির অধিকারী মাত্রই উচ্চাঙ্গের পরিহাসপ্রিয়। সেই পরিহাসপ্রবাহ পারিপার্শ্বিক সমস্ত মলিনতাকে সকল ক্লিন্নতাকে বিধৌত করিয়া এক অনাস্বাদিত আনন্দরাজ্যে লইয়া যায়। শুধু পুরুষ ভক্তগণ নহেন, স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার সহিত এমন নিঃসঙ্কোচে হাস্য-পরিহাস করিতেন যে, দেখিয়া বিস্ময়বোধ হইত। অথচ এই সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোককে অন্যান্যদের সম্মুখীন হইতে হইলে

তাঁহারা লজ্জাসঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহাদের সহিত বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের সহিত এমন অকুণ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন যে, দেখিয়া বিস্ময়বোধ হইত। অনেক সময় গভীরভাবে এ বিষয় চিন্তা করিয়াছি—কয়েক জন অন্তরঙ্গ ও বিশিষ্ট গুরুভ্রাতার সহিত এই প্রসঙ্গ লইয়া নিবিড়ভাবে আলাপ আলোচনাও করিয়াছি। ইহার ফলে সেই সময়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম তাহাই যে অভ্রান্ত তাহার প্রমাণ পাইলাম শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর। এই গ্রন্থের এক স্থানে শ্রীগুরু লিখিয়াছেন—১৩০০ সালে যখন তিনি বানরিপাড়া গিয়াছিলেন তখন সাজাল নামে এক জন মুসলমান ফকিরের দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। গোসাঁইজী ইহাকে এক জন উচ্চ অবস্থার পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাজাল ব্রহ্মচারিজীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তাঁহার সঙ্গীয় গুরুভাইদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"উনি কি মাইয়া না পুরুষ?' সকলে হাসিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবে ত বুঝি মাইয়ামানুষ।" একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি এর দাড়ি-গোঁফ দেখ না?" সাজাল বলিলেন—"হ্যার লাইগাইত জিগ্যাইলাম।" শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা সাজাল তাঁহার মধ্যে কান্তাভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বাহিরের কাঠামোখানা অর্থাৎ পুরুষাকৃতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, উচ্চকোটির সাধকদিগের জীবন-

স্বপ্নের মধ্য দিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পর শ্রীশ্রীঠাকুর মনে করিতেন যে, সন্ন্যাসের যোগ্যতা তাঁহার স্বভাবেই আছে এবং কামিনী সঙ্গেও তাঁহার চিত্তবিকারের কোন আশঙ্কা নাই। ১২৯৭ সালে, বৈশাখ মাসে তিনি স্বপ্ন দেখেন (সদ্‌গুরুসঙ্গ ১।১৬৬) যে তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসীবেশে তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন—"সন্ন্যাস ত ভেক নয়, উহা একটা অবস্থা—জিতকাম না হলে সিদ্ধিলাভ হয় না। সন্ন্যাসীর অন্তরের অসাধারণ দুর্ল্লভ অবস্থা একমাত্র গুরু-কৃপাতেই লাভ হয়। সন্ন্যাসীর একটা বাহ্য লক্ষণ মাত্র দেখ।' তিনি উলঙ্গ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়া অবাক হইলেন যে, তাঁহার উপস্থের চিহ্নমাত্র নাই, তাহা যোনিতে পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে স্বপ্ন নিজ জীবনে সার্থক হইয়াছিল।

১৩৩৬ সালে গয়া হইতে লিখিত তাঁহার এক পত্রে তিনি জনৈক শিষ্যকে লিখিয়াছেন—"বহুকাল হইতে আমার ছয় বৎসরের বালিকা, ষোল বৎসরের যুবতী বা ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধার মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ নাই। আমার পুরুষাঙ্গ যেন যোনিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রস্রাব করিবার প্রয়োজনে আমার অতি ক্ষুদ্র উপস্থটিকে গর্ত্ত মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিতে হয় * * *।"

শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্ত্রীলোকদের সহিত এই অবাধ মিশ্রণের ব্যাপার যাঁহাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিত—যাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না, কামাতীত এই মধুর অবস্থার নিগূঢ়

রহস্য এই সকল উক্তির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও তাঁহাদের সমস্ত অন্তর দিয়া তাঁহার এই শুকদেবসুলভ নির্ব্বিকারচিত্ততা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই অবাধে তাঁহার পুণ্যসঙ্গ করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।

আরও একটা বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ব্রহ্মচারিজী তাঁহার স্থূলদেহের সেবায় আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কয়েক বৎসর হয় স্বধামে গমন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ইংরাজী জীবনীগ্রন্থ সঙ্কলনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে এই অধম শ্রীশ্রীঠাকুরের অপ্রকাশিত ১৩০১—১৩০৬ সালের ডায়েরী (ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্তা মহানন্দ নন্দী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত) হইতে উপদেশ সংগ্রহে ব্যাপৃত। মোটামুটি যাহা স্মরণে আছে তাহার একস্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"আমার মনে হয় আমি যেন পূর্ণযৌবনা স্ত্রীলোক এবং গোসাঁইজী পরম সুন্দর যুবা। মিলনের জন্য প্রাণ আমার সর্ব্বদা ব্যাকুল। আমি যদি আমার প্রাণপ্রিয় গোসাঁইজীর বসিবার ঐ আসন হইতাম তবে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া এ বিরহ-জ্বালা জুড়াইতাম। আহা! আমি যদি গোসাঁইজীর চা সেবার ঐ পাথরবাটি বা নারিকেলের মালা হইতাম তবে শ্রীমুখের ওষ্ঠামৃত পান করিয়া জীবনযৌবন সার্থক করিতাম।"

ব্রহ্মচারিজীর উপরোক্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বৈষ্ণব-কবিগণের প্রার্থনার ধারা আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই সকলের মূলে

রহিয়াছে তাঁহার কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিভাব, যাহা আমরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এবং পরে গোস্বামী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি অন্যস্থানে লিখিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণের তীব্র বিরহে শ্রীমতী যেমন তাঁহার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদা উন্মনা ও পাগলপ্রায় থাকিতেন সামান্য শব্দ কর্ণগোচর হইলে যেমন তাঁহার আগমন আশায় সচকিত হইয়া উঠিতেন, আমার অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। এ যেন জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের—

"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপবানম্।"

ব্রহ্মচারী মহারাজের অপ্রকাশিত পাঁচ বৎসরের ডায়েরী প্রকাশিত হইলে তাঁহার তপঃসিদ্ধ পুণ্যজীবনের মাধুর্য্যের দিকটির অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে, বহু সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে। শ্রীমুখের আদেশ উপদেশ থাকা সত্ত্বেও এই সকল অমূল্য সম্পদ যাঁহাদের নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে তাঁহারা ঐগুলি এই সুদীর্ঘকাল লোকলোচনের গোচর করিতে চাহেন না, তাহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ। তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যের যে ইহাতে ষোল আনা অধিকার রহিয়াছে এ কথা না বলিলেও চলে। আমরা বলি ব্রহ্মচারিজী যে শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন তাহাতে তাঁহাকে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের এমন কি কয়েক সহস্র শিষ্য বা ভক্তের সাধারণ সম্পত্তি মনে করিলে তাঁহার প্রতি, গোসাঁইজীর আদর্শের প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহার গুরুর মতন তিনিও ছিলেন

সমগ্র জগতের—সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থনিচয় জগতের সকল শ্রেণীর সাধকের পক্ষে পথপ্রদর্শক, অপরিহার্য্য সাধনসহায়। বিশ্বকে তাঁহার অমর অবদান হইতে বঞ্চিত রাখার অধিকার আমাদের নাই। একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহার তথা সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিক্ষাসমূহের ব্যাপক-ভাবে প্রচারের পুণ্যব্রত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

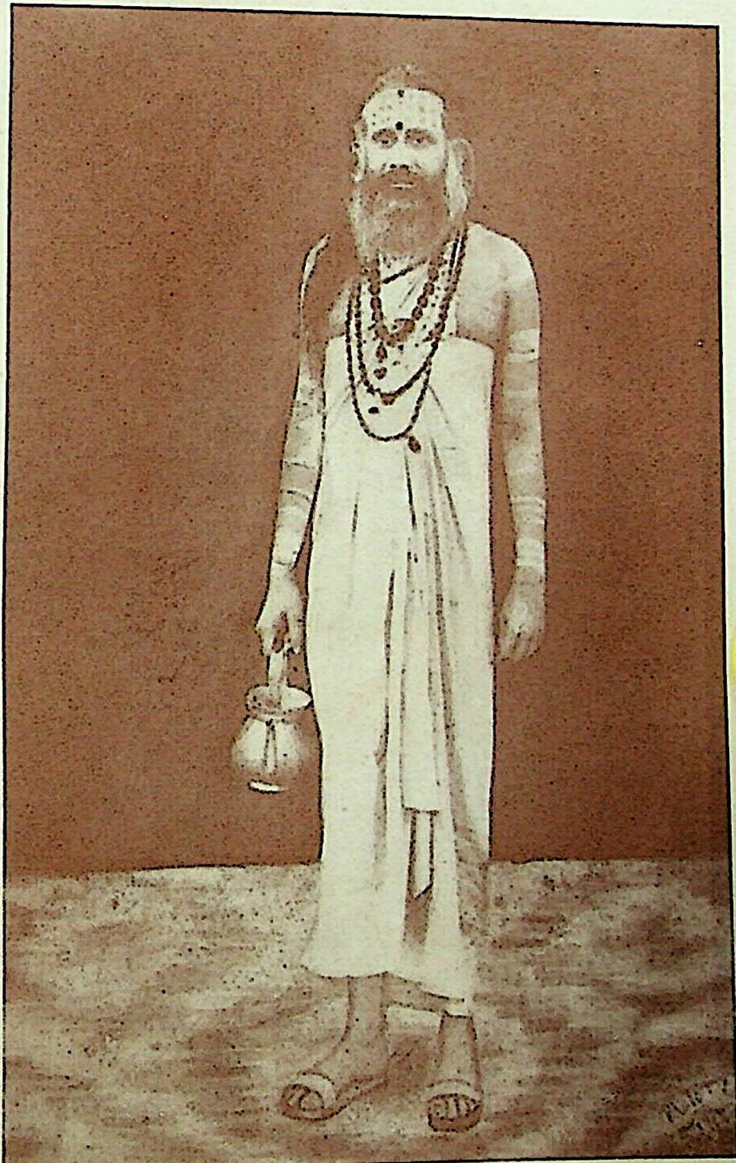
——:o:——

যোগিরাজ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ

দ্বিতীয় বর্দ্ধিত সংস্করণ—২·২৫ নঃ পঃ

(নানা সমালোচনার সারাংশ)

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর নিত্যসঙ্গী অন্তরঙ্গ শিষ্য নীলকণ্ঠ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজী সর্ব্বজনপূজ্য পুণ্যশ্লোক সিদ্ধপুরুষ। গ্রন্থকার ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁহার প্রিয় সুযোগ্য শিষ্য। তিনি তাঁহার ও অন্যান্য ভ্রাতাভগ্নীর গুরুদেব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অনেকগুলি ঘটনা আলোচ্য পুস্তকখানিতে সঙ্কলন করিয়াছেন। এমন সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনে অসাধারণত্ব কিছু থাকিবেই; কিন্তু এই সব অসাধারণত্বেরও একটা রীতি আছে। প্রত্যুত এগুলি সাধারণ যোগবিভূতির মত নয়। এগুলি অপরকে বিস্মিত বা অভিভূত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। ফলতঃ যোগাঙ্গ সাধকদের জীবনেই কর্ম্ম হিসাবে বিভুতির বিস্তার সম্ভব হইতে পারে। যাহারা যোগারূঢ় বা যোগসিদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে সেগুলি কর্ম্ম নয়—শম অর্থাৎ শ্রীভগবানে নিষ্ঠাই সেইগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ভগবৎশক্তিই প্রদীপ্ত হয়। অহঙ্কারের উর্দ্ধে আত্মার সেখানে ক্রিয়া। প্রেম, মৈত্রী এবং কৃপাই তাঁহাদের অন্তরের উৎস হইতে এইরূপে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া পরিবেশকে পবিত্র করে এবং চিন্ময় রসে সকলের চিত্ত উজ্জ্বল করিয়া সনাতন ও সার্ব্বভৌম সত্যের সন্ধান দেয়। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবন এবং আচরণই অধ্যাত্মশাস্ত্রের টীকা ও ভাষ্য। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অধ্যাত্ম-রসপিপাসু নরনারী মাত্রেই উপকৃত হইবেন, ভরসা পাইবেন এবং আনন্দলাভ করিবেন।



শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী
(প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগুরু—শ্রীশ্রীসদ্গুরু সাধন সঙ্ঘ)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধনসঙ্ঘের অন্যান্য পুস্তক

সারা ভারতবর্ষের ও বিলাতের বহু মনীষী দ্বারা ও সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত লেখকের ইংরাজী অবদান—

Saint Bijoykrishna—Brahmachari Gangaanandaji, Re. 1. Sri Sri Haridas Namananda, Vice Principal, Vaishnab Biswa-Niketan says—

The picture of "Saint Vijoykrishna" as presented by Brahmachari Ganganandaji, is a unique contribution to the cause of spiritual culture and Eternal values. A short life sketch of Sri Sri Vijoykrishna Goswami was a desideratum for the non-Bengali Indians and the English-speaking world. None could remove this long-felt want so admirably well as has been done by Brahmachari Ganganandaji with his special gifts of deep insight and wide outlook, combined with moral earnestness and spiritual fervour. The author is a worthy disciple of the noble saint Srimat Kuladananda Brahmachari, who himself was the most favourite and intimate Godson of the great Prabhupada Vijoykrishna Goswami and wrote the wonderful volumes entitled "Sree Sree Sadguru Sanga" which remain unsurpassed in moral and Spiritual values even to this day.

The great Adwaita Acharyya Prabhu of Santipur, whose austere penances and devout Bhajan alone brought the Supreme Lord Sri Gouranga from the abode of Golak to the capital of Gaudamandal, left behind him a dynamic faith and storehouse of spiritual energy, and it is to this sacred heritage that Prabhupada Vijoykrinshna and his disciples owe

their inspiration Divine. The sacred river Bhagirathi flows unchecked from the Himalayan heights of the Gangotri to the Bay of Bengal. So does the current of Bhakti, Jnan & Karma, originated by the Vedic, Upanishedic, Gitaic and Bhagavatiya wisdom and culture flow uninterruptedly along the channel of Prema Bhakti generated by Mahaprabhu Sri Chsitanya, Lord Nityananda & Lord Adwaita Acharyya. In saint Vijoykrishna's life one will find the balanced union and perfected development of the modes of Paramarthic Sadhana & Bhajan of ancient India, reinforced by all the valuable contributions of service and philosophy of the modern age. The brochure under review will be welcome and appreciated by all who are interested in moral and spiritual training of our youths based on the harmony of faith and culture. The value of the work has been greatly enhanced by the addition of a short Life-sketch of Sri Kuladananda Brahmachari as well as by the preface and foreword written by competent leaders of the Sri Sri Sadguru Sadhan Saugha, a centre of moral, intellectual and religious culture and an organisation that ably radiates spiritual rays of Divine cosmic Suns, Moons and Stars for the welfare of humanity.

Leaders like Bipin Chandra Pal, Aawani Kumar Dutta, Manoranjan Guha Thakurata, Lala Rajpat Rai, Satish Chandra Mukherjee, Kanailal Dutta and others drew their inspiration from Saint Vijoykrishna and they worked wholeheartidly way for country's emancipation.

পারের কড়ি—ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর পত্রাবলী—

২ খণ্ড—২৲ ৩৲ টাকা

(অভিমতের সারাংশ)

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্মপথে চলিয়া যাঁহারা জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁহাদের অন্যতম ; শুধু তাহাই নয়, গোসাঁইজী যে জ্ঞানের আলো জালাইয়াছিলেন, সেই আলোকবর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়া তিনি অজস্রের জীবন-পথ আলোকিত করিয়াছেন। তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ বর্ত্তমান গ্রন্থ। পত্রে তাঁহার হৃদয়বত্তা, নিরহঙ্কার, অন্তরের আনন্দ-স্পন্দন, সমবেদনা মধুর সারগর্ভ উপদেশাবলী স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়াছে। সংসারিক ও ধর্মজীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান উপদেশ এই পত্রসঙ্কলনে গ্রথিত হইয়াছে। গল্পচ্ছলে অতি কঠিন তথ্যও যে অতি সহজে প্রকাশ করা যায়, তাহা এই পত্রাবলীতে প্রমাণিত হইয়াছে। লিখনভঙ্গীর জন্য পত্রগুলি সাহিত্য প্রসাদমণ্ডিত হইয়া ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

উত্তরাই—পারের-কড়ির হিন্দী অনুবাদ (২ খণ্ড একত্রে) ৪৲ সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক পত্রিকা 'কল্যাণের' সম্পাদক শ্রীহনুমান প্রসাদ পোদ্দারজীর ভূমিকা সহ—

ভারতের বহু সাধু মহাত্মা মনীষিগণ কর্ত্তৃক ও সুপ্রসিদ্ধ সকল পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

জটিয়াবাবা—মারাঠি ভাষায় গোস্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী —১॥০ সন্ত তুকদোজী মহারাজের ভূমিকা সম্বলিত।

পুণা, বম্বে, নাগপুর, হায়দারাবাদ, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের সকল পত্রিকায় প্রশংসিত সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন স্থানীয় বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু মহিমা—১ম ॥০ ও ২য় খণ্ড—॥০

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। আলোচ্য পুস্তকগুলি উক্ত গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। গোঁসাইজীর কোন কোন ঘটনা সংগ্রহ করিয়া সাধারণের উপযোগী তাঁহার অমূল্য উপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছে। বিষয়ের বিন্যাসভঙ্গী এমনই সুন্দর যে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষের মধুর উপদেশ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পুস্তকগুলি সকলের পক্ষে নিত্য পঠিত হইবার উপযুক্ত।

যুগ প্রয়োজনে সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—শ্রীবঙ্কিম সেন—।০

ভারতভূমি বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলের আধ্যাত্ম-সাধনার পটভূমিকায় গ্রন্থকার শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর জীবনলীলার এক রেখাচিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভুর জীবনে যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব্ব সমাহার দেখা যায়। এই সার্থক মহাজীবনের সত্তায় প্রেমভক্তির যে স্রোতধারা তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষ করিয়া তাহা যে এদেশের সমাজ-জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছে, ইহাই গ্রন্থকারের বক্তব্যের নির্য্যাস। শ্রীযুক্ত সেন বিশিষ্ট সাধক ও সুসাহিত্যিক, রস মধুর বর্ণনা ও ভাবের ব্যঞ্জনায় এই পুস্তিকাখানি তাই অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত ক্ষুদ্রকার হইলেও গ্রন্থখানি প্রভু বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকারের দাবী রাখে।

—:০:—

সাধন রাজ্যের অপরিহার্য্য গ্রন্থাবলী

১। পারের কড়ি—ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ,
প্রথম খণ্ড—২৲ দ্বিতীয় খণ্ড—৩৲

২। উতরাই—হিন্দী পারের কড়ি, দুই খণ্ড একত্রে—৪৲

৩। অমৃতের সন্ধান—ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়—॥৵০

৪। শাস্ত্র সংশয় নিরসন—শ্রীভবেন্দ্র মজুমদার—৫৲

৫। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ—শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
পাঁচ খণ্ড, একত্রে—১৭৲

৬। বক্তৃতা ও উপদেশ—গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ—১॥০ ও ২৲

৭। **Saint Bijoykrishna**—
Brahmachari Gangananda—১৲

৮। পরমপুরুষ গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ—শ্রীআশুতোষ মণ্ডল—।৴০

৯। যুগ প্রয়োজনে সদ্‌গুরু—শ্রীবঙ্কিম সেন—।০

১০। **Life of Bijoykrishna**—Dr. B. C. Das—৪৲

১১। **Brahmachari Kuladananda**—
Dr. B. M. Barua, D. Lit London.
Foreword—Dr. S. Radhakrishnan—৫৲

১২। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারজীর—ভাগবত ধর্ম—১৸০,
শ্রীশ্রীচণ্ডী—৸০, ॥০, নিম্বাক দর্শন ও বিশ্বসমস্যা—।৵০,
নারদীয় ভক্তিসূত্র—।৴০, শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র—।৵০,
বিশ্বসমস্যায় শ্রীশ্রীসন্তদাস—।০

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ
৬০, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬